বৈষ্ণব পদরত্নাবলী

বৈষ্ণব পদরত্নাবলী

সম্পাদনা করেছেন

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন সাহিত্য
কলিকাতা-২০

প্রকাশক
সুশীলকুমার সিংহ
নতুন সাহিত্য ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলিকাতা-২০
মুদ্রক
সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
গ্রন্থন
সিটি বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৯৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

অঙ্গসজ্জা : পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৮
দাম পাঁচ টাকা

নয় বেগের শত তরঙ্গ বাহু-ভুজঙ্গে বাঁধা—
হঠাৎ তূর্যে নামে যে তীক্ষ্ণ তীব্র বাঁশির ভাষা
বৃষ্টি মরমে পশে। নীলে নীল যমুনার তীরে রাধা
শুনত যেমন, কিংবা যেমন আমাদের ভালবাসা।

—বিষ্ণু দে

বৈষ্ণব কবিতা : পট ও পটভূমি

কিছু কমবেশি পাঁচশো বছর ধরে বাংলায় বৈষ্ণব কবিতাবলী রচিত হয়েছে। এরা সংখ্যায় কয়েক সহস্রের অঙ্কে। সংখ্যার আধিক্যে এবং গুণের উৎকর্ষে, জন-মানসে এদের অধিকার ছিল কতখানি, তা সহজে বোঝা যায়। (বহুকাল ধরে শাস্ত্র-শাসিত বাংলাদেশের অনড় সামাজিক অবস্থায় ভাবাবেগের মূল্য ছিল অস্বীকৃত। বৈষ্ণব কাব্যধারাই ছিল সেই জরদ্গব অনড়তার মাঝখানে একমাত্র চলিষ্ণু আবেগ-স্রোত।) এই চলিষ্ণু আবেগধারাকে সম্যক উপলব্ধি করতে গেলে যে সামাজিক পৃষ্ঠপটের সঙ্গে তা লগ্ন ছিল তারও সম্যক পরিচয়-গ্রহণ প্রয়োজন। ইতিহাসের ইঙ্গিত অনুসরণ করলে দেখা যায় যে যেহেতু বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ভিতরে অখণ্ড ঐক্যসূত্রের কঠিন বন্ধন কখনই স্থাপিত হয়নি, সে কারণে তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশিতে হৃদয়ানুভূতির বেগবতী ধারাও কখনও সহজে স্পষ্ট হতে পারেনি। বিচারহীন আচারের মরুবালুকার উপাদানে গড়া ঐক্যেই তখনকার বাংলাদেশের পরিচয়ের ইঙ্গিত। সমাজের উচ্চকোটির জীবনে, রাজকর্মচারী ও পুরোহিতদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকর্মের দোর্দণ্ড প্রতাপ এবং নিম্নস্তরের জীবনে বহু সাধন-রহস্যের গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথের পিচ্ছিলতায় পঙ্কিল পদক্ষেপ, বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্বের অন্তিম-পরিচয়ের প্রধান কথা। অর্থনীতির দিক থেকে দেখতে গেলে তাম্রলিপ্তির মহিমা ততদিনে দূরগত। বাণিজ্য-স্রোত শুষ্ক। কৃষি-নির্ভর বিত্তহীন জাতির জীবনে পৌরুষের কোনো অঙ্গীকার নেই। (লোকজীবনের বেগবান স্রোত সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্য-ক্রিয়াবাদীদের নেই কোনো আগ্রহ, বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের অথবা গুহ্যসাধন-পন্থীদের সাম্প্রদায়িক প্রাচীর বেষ্টনী ছিল সর্বসাধারণের কাছে দুর্ভেদ্য।)(এই সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এদেশে ঘটেছিল মুসলমান আক্রমণ এবং চৈতন্যদেবের ধর্ম-আন্দোলন। বৈষ্ণব কবিতা এই শেষোক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুকাল ধরে আচার-বিজীর্ণ, শতধা-বিদীর্ণ অথচ সংস্কার-বিশুষ্ক দেশে, মানবিক আবেগকে দিয়েছে পরম মূল্যবান স্বীকৃতি।) সেই স্বীকৃতির স্বরূপ এবং কাব্যরূপের বৈশিষ্ট্য আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়।

এর আগে মানবিক আবেগকে স্বীকার করতে আমরা ছিলাম পরাঙ্মুখ। কি জীবনে কি শিল্পে মানবিক আবেগের কোনো জয়গান ধ্বনিত হয়নি। আদিপর্বে এবং মধ্যপর্বে, বাঙালীর ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, আমাদের জীবন ছিল আচারমূলক এবং কর্তব্যমূলক। কখনো সাধনমার্গের নির্দেশে, কখনো স্মৃতির অনুশাসনে সে জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আমরা পত্নীসঙ্গ উপভোগ করেছি পুত্রার্থে। আমরা পুত্র যাচ্ঞা করেছি পুন্নাম নরকের ত্রাসে। স্মৃতি-অনুশাসিত কর্তব্য অথবা গুহ্যসাধনের নিগূঢ় সংকেত—করণীয় অথবা অকরণীয়ের দুই কূল বাঁচিয়ে আমাদের ক্ষীণধারা জীবন-নদী বয়ে চলেছিল. যুগ-যুগান্ত ধরে। মাঝে মাঝে জীবনের ব্যথা-বেদনার অনুভূতি যে আচার এবং কর্তব্য-নিরপেক্ষ, তার প্রমাণ পেয়েছি নানা লৌকিক গানে এবং মঙ্গলে। গৌরীদান অবশ্যকর্তব্য হয়েও সূর্য মঙ্গলের গানে অথবা পরবর্তীকালের শাক্ত পদাবলীতে, মাতৃবিচ্ছেদাতুর কন্যার, অথবা কন্যাবিচ্ছেদ-বিদীর্ণ মায়ের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। বৈষ্ণব পদাবলী ব্যাপকভাবে এবং গভীর সুরে মানবিক আবেগের সেই দিব্য-রূপকেই খুঁজেছে, যা তার রস-সাহিত্যের উপাদান। সে আবেগের নিরীক্ষাভূমি যে প্রত্যক্ষ মানবজীবন, এ-উপলব্ধির পথে হয়তো বৈষ্ণব কবিদের ভীরু সংকোচ ছিল, কিন্তু সেই মানবিক আবেগেরই দিব্য রূপায়ণে যে নিত্য-বৃন্দাবনের দ্যুতি—এই ঘোষণায় তাঁরা বাংলাদেশের রস-স্বজনের ইতিহাসে অমর। তাঁরাই প্রথম বললেন—কিছুর জন্য কিছু নয়। কোনো ধর্মীয় সার্থকতা, কিংবা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রলোভনে এই অনুভূতিজনিত আবেগের স্বীকৃতিকে তাঁরা প্রণম্য বলে ঘোষণা করেননি। এই আবেগের বিশুদ্ধিতেই অলৌকিকের স্বাদ—বৈষ্ণব যাঁকে বলেছেন ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরের জন্য স্নেহ, ভালবাসা, সখ্য, প্রীতি—সব কিছুতে মানবিক আদর্শের ছায়া। সেই ভক্তিরসের স্নিগ্ধ মুকুরে যার প্রতিবিম্ব, নর রূপেই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ভালবাসাতেই তার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। জীবনের এই শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞানকে চিনতে পেরেই বৈষ্ণব কবি বলেছেন—প্রেমই দ্বিতীয় ব্রহ্ম। এই মানবিক অনুভূতিকে কবিরা অঙ্গীকার করতে পেরেছিলেন বলেই বৈষ্ণব ভাবাদর্শের জয় হয়েছিল বাংলাদেশে। আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে এই ভাবাদর্শ রবীন্দ্রনাথের কাল, এমন কি আধুনিক কাল পর্যন্ত, রস সিঞ্চন করে চলেছে, তার মূলে বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারকদের কৃতিত্ব নেই, নেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রন্থাবলীর

অবদান। বৈষ্ণব কবিরাই এর মানব-মূল আদর্শের শ্রেষ্ঠ শারাংশার বেঁধে রেখে গেছেন কাব্যের আধারে। সাধারণ আপামর বাঙালী বৈষ্ণবতাকে যত জানে, তার চেয়ে বেশি জানে বৈষ্ণবের রচিত ভালবাসার কবিতাগুলিকে। কেননা এই প্রেমের কবিতাগুলিতেই প্রথম বলা হয়েছিল, যে ধাতা, কাতা অথবা বিধাতার বিধানেও ছাই দেওয়া যায়, এই প্রেমের মূল্যকে পরম বলে জেনে। দেশাচার অথবা লোকাচার, শাস্ত্র কিংবা স্মৃতি, কোনো ধর্মীয় অনুশাসন অথবা সাধন-পদ্ধতির চতুঃসীমা এই প্রেমের আবেগকে বন্দী করতে পারেনি। বৈষ্ণবের নায়িকা, জীবনের যন্ত্রণার মন্দিরে এই প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রেমই সে মন্দিরের বিগ্রহ—"তারই স্নান লাগি হৃদি যমুনায় আঁখির কুম্ভ ভরি।" আধুনিক কবি বলেন—প্রেমের চেয়ে জীবন বড়ো। বৈষ্ণবের নায়িকা বলেছে জীবনের চেয়ে প্রেম বড়ো। আধুনিক কবি যে অর্থে বলেন, 'জীবন বড়ো'—সে অর্থের মূল-কথা হল জীবনের বিশালতায় প্রেমের আবদ্ধতার হাত থেকে মুক্তি ঘটে। বৈষ্ণব কবি সে-ক্ষেত্রে বলেছিলেন বদ্ধ জীবনেরই মুক্তি ঘটে প্রেমে। মুক্তির প্রশ্ন উভয়ের ক্ষেত্রে মৌল প্রেরণা। এখনকার বিশালতর জীবনের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় নানা বৈচিত্র্যের মাঝে ব্যক্তি স্বরূপের নানা বিকাশ—তাই জীবনের মাঝে মুক্তির সন্ধান আধুনিক কবির কথা। তখন জীবন ছিল ছকে বাঁধা। সেই আচারবদ্ধ, শাস্ত্র-শাসিত, প্রথাবদ্ধ জীবনে প্রেমই এনে দিতে পারত ব্যতিক্রম। যে ব্যতিক্রমের জন্য পিপাসা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম, তার সুবর্ণ অবকাশ একমাত্র ছিল প্রেমের পথে। এ-কথা বৈষ্ণব কবিরা অনুভব করেছিলেন। যাকে আমরা চেতনার ও চিন্তার আধুনিকতা বলি, বৈষ্ণব কবিরা তার প্রসাদ পাননি। কিন্তু প্রচলিত আবেষ্টনীর হাত থেকে আবেগের মুক্তিসাধনে তাঁরা প্রয়াসী হয়েছিলেন।

* * *

নিশ্চয়, বৈষ্ণব কবির সে মুক্তি-সাধনের প্রয়াসে প্রচুর দৌর্বল্য ছিল। জীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের জল-মাটি-আকাশের স্রোত-গন্ধ-হাওয়ায় সে প্রয়াসের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়নি। বারেবারে রীতির বন্ধনকে মেনে পথ চলতে চলতে, ফাঁকে ফাঁকে হারিয়ে গেছে সাবেগ উচ্চারণের স্পষ্টতা। এও সত্য যে কবিতাগুলির অংশে যত ক্ষণিক উদ্ভাসন, সমগ্রে তত অনুভূতির অটুট আসন পাতা হয়নি।

এবং সেই অসঙ্গতির পশ্চাদ্বর্তী দুর্বলতায় উপলব্ধির দুর্বলতা বা অভিজ্ঞতার খণ্ডতাই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে,—তথাপি বহু ব্যর্থতার পরেও যে কাঠিটি জ্বলেছে তার অগ্নি-সম্ভাবনায় যেমন কোনো সন্দেহ থাকে না, সফল ও রসে সার্থক বৈষ্ণব কবিতায়ও তেমনি সন্দেহ থাকে না যে, সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নির্দেশের প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে বৈষ্ণব কবি তাঁর অনুভূতিকে যাচাই করতে ভয় পাননি। প্রেমের এই নিষিদ্ধতায়, বৈষ্ণবের কাব্যে আবেগের পুষ্টি-সাধন ঘটেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাধা কুলবধূ। প্রতি দিবসের সাংসারিকতার মাঝখানে একদিন হঠাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা। এই দেখা থেকে প্রেমের যন্ত্রণার উন্মেষ। কুলবধূর দিক থেকে এ-ব্যাপার নিশ্চয় অসামাজিক। অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেই নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন নিশ্চয় উঠত। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার ক্ষেত্রে সে-জাতীয় প্রশ্ন ওঠে না। না ওঠার হেতুরূপে যদি কৃষ্ণের ভগবৎ-স্বরূপের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করা যায়, আমাদের মনে হয় তাহলে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা লাভ করা যাবে না। বাংলাদেশের লৌকিক কাব্যধারায়, ময়মনসিংহ গীতিকায়, মইষালের গানে যে-প্রেমের আবেগকে ব্যবহার করা হয়েছে—সেখানেও নিঃসন্দেহে ভগবত্তার কোনো সম্পর্ক নেই, 'অপ্রাকৃত' এই শব্দটিকে ব্যবহারের কোনো অবকাশ সেখানে নেই। এখানেও নিষিদ্ধতার জন্য নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নকে কৃষ্ণের ভগবত্তায় রোধ করার প্রচেষ্টাই সব কথা নয়। আসলে আবেগের এবং অনুভূতির তীব্রতা ও বিশুদ্ধির কাছে যেমন পরাভূত হয়েছে সামাজিক নীতির প্রশ্ন, তেমনি হারিয়ে গেছে রাধার আচরণের প্রাকৃত স্থূলতা। এই বিষয়টি লক্ষ্য করেই শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন :

> পূর্ববর্তীরা সম্ভোগকেই প্রধান করিয়া প্রেমকে অনেকখানি স্থূল করিয়া ফেলিয়াছেন ; আর বৈষ্ণব-কবিগণ বিরহকে প্রধান করিয়া প্রেমের ভিতরে সূক্ষ্মতার ও অতলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিরহ-অবলম্বনে প্রেমের এই যে সূক্ষ্ম এবং গভীর সুর তাহাই রাধাপ্রেমকে আধ্যাত্মিক লোকে উত্তরণ করাইতে সহায়ক হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতাকে সাহিত্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাই, পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণিত প্রেম হইতে রাধা-প্রেমের যে পার্থক্য তাহা দুইটি কারণে ঘটিয়াছে, প্রথমত একটি তত্ত্বদৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাব, অপরটি হইল বিরহকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের রূপ হইতে অরূপে—প্রাকৃত মর্ত্যভূমি হইতে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে যাত্রা।

বিরহের অনুভূতিতে বৈষ্ণব-কবিতার বিশিষ্টতা। এবং এই অনুভূতির অগ্নিদাহেই পুড়ে ছাই হয়েছে সামাজিক নীতির প্রশ্ন। লৌকিক গাথা কাব্য-গুলির সঙ্গে বৈষ্ণব-কবিতার এই সূত্রে আত্মীয়তা অতি গভীর। সেখানেও বিরহানুভূতিতে কল্পনার দিব্য বিকাশ, এখানেও বিরহকেই প্রধান করে তোলা হয়েছে—সূক্ষ্মতা ও অতলতা সৃষ্টির জন্য। বৈষ্ণব-কাব্যের সমস্ত আয়োজনই প্রেমাস্পদের সঙ্গে ব্যবধানের যন্ত্রণাকে ধ্বনিত করার জন্য। প্রেমের পার্থিব অপরিপূর্ণতার বেদনা থেকে অপার্থিব দ্যুতির সন্ধানে চলাই বৈষ্ণব কবির প্রয়াস। নিষিদ্ধতা, প্রতিকূলতা, কলঙ্ক—সমস্ত কিছুর ব্যবহার ঘটেছে আর এই বেদনাও মুহূর্তে-মুহূর্তে তীব্র হয়ে উঠেছে। তত্ত্বদৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাব, সঙ্গে সঙ্গে অপার্থিব হয়েও, মানসিক যন্ত্রণায় পার্থিব হতে পেরেছে—স্পর্শ করতে পেরেছে মানুষের মনকে, তত্ত্ব-নিরপেক্ষভাবে। যা কিছু স্থূল দৈহিকতা, বিহার-প্রতিবিহারের বর্ণনার প্রথানুগত্যে যা কিছু ক্লিন্নতা, রূপ-বর্ণনায় অতিশয়োক্তি, অলংকারের প্রায়শ ব্যর্থতা—সকল অকৃতার্থতা যেন ধুয়ে গেছে সেই বেদনার করুণ-রঙিন স্পর্শে। বেদনার গৈরিকবর্ণে অনুরঞ্জিত সেই প্রেমের অধিষ্ঠাত্রীর বসন। তাই মেঘের দিকে চেয়ে, ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করে, কখনো জলের দিকে বা অরণ্যের দিকে তাকিয়ে, সেই প্রেমিকার চোখে জল আসে—পূর্বরাগের উজ্জ্বল প্রভাতেই যেন তার মনে হয়, 'হেরি অহরহ তোমারই বিরহ বিশ্বভুবন মাঝে।' স্বভাবতই এই বিরহের উৎসে অকৃতার্থতার বোধ। যে প্রেমের সাংসারিক স্বীকৃতি নেই, যার জন্যে নেই সামাজিক বরণমাল্য—অকৃতার্থতায় তার পরিমণ্ডলে আসে এক দিব্যদ্যুতি। সেই দিব্যদ্যুতির ক্ষণে-ক্ষণে স্ফুরণে বৈষ্ণব-কাব্যের আকাশ চমকিত। প্রেমিক প্রেমিকার চেতনায় সর্বদা এই অচরিতার্থতার বোধ কাজ করেছে বলেই—দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া—এই প্রেমবৈচিত্র্য সম্ভব হয়েছে। আক্ষেপানুরাগ তীব্র হতে পেরেছে প্রতিহত ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিড়ম্বনার কথা স্মরণ করে।

* * *

অবশ্যই প্রেমিকার এই ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা বলা যাবে না। সামাজিক লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে এর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রথম স্ফুলিঙ্গকে

খুঁজতে গেলেও হতাশ হতে হবে। হয়তো এ-কেবলমাত্র সংসারের বাঁধা ছকে অপ্রতিরোধ্য প্রেম কী পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি করে তার প্রমাণ। কিন্তু অনুভূতির স্বকীয়তায় এ যেখানে স্ব-কণ্ঠভাষী, সেখানেই হারিয়ে গেছে এর সকল কৃত্রিমতা। ইওরোপের মধ্যযুগীয় প্রেমের আখ্যানেও এই শাশ্বত প্রেমের অনুভবের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সেখানেও ক্রবাদুরদের গানে ব্যক্তিগত আবেগময় বাসনাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সুফিবাদের সঙ্গে অলক্ষ্য আত্মীয়তা অথবা প্রাচ্যভাবাপন্নতা প্রভৃতির সাহায্যে ক্রবাদুরদের প্রেমের মরমী আকুলতাকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে প্রেমাখ্যানের পরোক্ষ ইঙ্গিত এই যে, আচরণের দিক থেকে সমাজকে বাঁধলে, ধর্মীয় নির্দেশের চতুঃসীমায় জীবনের মৌল প্রবৃত্তিগুলিকে বন্দী করলে আবেগের মুক্তি নেই। সেই মুক্তির গোপন স্বাদ পাবার জন্যই ঐ গানগুলি। বিখ্যাত কাব্য-কাহিনী বা গীতি-আলেখ্য, Tristan and Iseult যার নায়ক-নায়িকা, সেখানে এক স্থানে Iseult জিজ্ঞাসা করছে Tristan-কে, 'We have lost the world and the world has lost us. How does it seem to you, Tristan my love ?' Tristan জবাব দিল, 'When I have you with me beloved, what do I lack ? If all the worlds were with us here and now, I should have eyes for nothing but you alone.' যে-কথা এখানে Tristan-এর মুখে আমরা শুনলাম, রাধার প্রেমের ঘোষণায় যেন তারই প্রতিধ্বনি।—

ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর বসতি
কিবা বা করিবে বাপ মায়।
জাতি জীবন ধন এ রূপ যৌবন
নিছনি ফেলিব শ্যাম পায়॥
সমুখে রাখিয়া নয়ানে দেখিমু
লইয়া থাকিমু চোখে চোখে।
হার করিয়া গলায় গাঁথিয়া
লইয়া থাকিমু বুকে॥

এই কবিতাটির শেষে ভণিতার আগে বলরাম দাস জানাচ্ছেন যে রাধার ইচ্ছা করছে এমন এক দেশে চলে যেতে যেখানে 'রাধা' বলে কেউ পিছু ডাকবে না,

কোনো সাংসারিক বা সামাজিক আহ্বান তাকে বিরক্ত করবে না। এই পলায়নী অভীপ্সা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত বাসনার তীব্রতার দ্যোতক। সমাজের অনড় পটভূমিতে সেই তীব্রতা বিদ্যুল্লেখার মতো ঝলসে উঠেছে। অসামাজিক প্রেম বলেই মিলনেও যেন চরম অতৃপ্তি—ক্রবাদুরদের গানে এবং বৈষ্ণবদের কবিতায় এই বোধের ব্যবহার ঘটেছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বৈষ্ণব এবং ক্রবাদুর কবিরা সকলেই নারী এবং পুরুষ উভয়ের ভূমিকাতেই কথা বলতে পারেন। মিলনের স্বল্পকালীনতার জন্য সৃষ্টির দিকে চেয়ে তার নিষ্ঠুর নিয়মানুবর্তিতায় আর্ত মনের বেদনা নারী-কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে সুন্দরতর ভাবে:

এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায় ॥

অজ্ঞাতনামা ক্রবাদুরের কণ্ঠেও রাত্রি প্রভাতের বেদনা:

Oh would to God night might forever stay,
And my friend never again be far away,
And the watchman never spy the dawn of day!
Oh God! Oh God! How quickly dawn comes round.

(ওগো ঈশ্বর, আজ রাতি হোক অফুরান চির-রাতি,
রাত্রি থাকুক, দূরে যেতে যেন না পারে আমার সাথী,
প্রহরী না যেন দেখে দিবসের প্রথম আলোক-ভাতি—
হায় ঈশ্বর, এত তাড়াতাড়ি দিবস ফিরিয়া আসে!) *

অবশ্যই ক্রবাদুরদের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের মিল দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এবং সে প্রয়াসে কোনো সার্থকতাও নেই। আমরা যা অনুভব করেছি তা হল এই যে উভয় ক্ষেত্রে প্রথার হাত থেকে প্রেমের অভীপ্সাকে মুক্ত করার

* কাব্যানুবাদ সম্পাদকের।

প্রচেষ্টা বিদ্যমান। উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে তুলনীয় অপর একটি বৈষ্ণব কবিতা লক্ষণীয় :

বরুণক দেশ রয়নি চলি গেল।
অরুণা অতি সুরপতি-দিগ ভেল॥
ঐছে সময়ে নিজ কেলি-নিবাসে।
বেশ কয়ল পিয়া বহু প্রতি আশে॥
আধ আধ তাহে না পূরল আশ।
হেরি বিঘিনি কত ছাড়য়ে নিশাস॥
না কহ চিতহি অতিশয় খেদ।
জ্ঞানদাস কহ বিহিক সম্ভেদ॥

ত্রুবাদুরদের মতো বৈষ্ণবদেরও পরকীয়া প্রেমের উপাদানই কাব্যে সর্বস্বতা লাভ করেছে। বিধি লঙ্ঘনের বেদনা ও আবেগ এখান থেকে রচিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই বেদনার বা যন্ত্রণার দায় বহন করতে হয়েছে নারীকে। সম্ভবত প্রথা বা আচারের শৃঙ্খল পুরুষ-প্রাধান্যের সমাজে অধিকতর দৃঢ় হয়ে চেপে বসে নারীর মণিবন্ধে। তাই বৈষ্ণব কবিদের ক্ষেত্রে অন্তত দেখা যায় এই প্রেমের আর্তি পুরুষের কণ্ঠে কখনো কখনো ধ্বনিত হলেও, নারী-কণ্ঠেই এর তীব্রতা মানিয়েছে ভালো। যন্ত্রণা ও আনন্দের দোটানায় বৈষ্ণব কবির নায়িকা আশ্চর্যভাবে জীবন্ত এবং জ্বলন্ত। বিষ্ণু দে ঠিকই বলেছেন যে 'প্রেমের বেদনা যে দুই চলিষ্ণু ব্যক্তির চলিষ্ণু সম্বন্ধের দোটানার যন্ত্রণা ও আনন্দ, বৈষ্ণব কবি এটা আমাদের বিস্ময়করভাবে জানিয়ে দেন।' মানুষের অভিজ্ঞতার গভীর সমুদ্রে বৈষ্ণব কবিরা আমাদের ডুবিয়ে দিতে পারেন এই যন্ত্রণা আর আনন্দের নিখাদ অনুভূতির জোরে। এই অকৃত্রিম অনুভূতির জন্য বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের কাব্য-সম্ভারকে জন-মনোগ্রাহী করে তুলতে পেরেছিলেন। সংস্কৃত রীতিবাদীদের মতো কনভেন্‌শনের চর্চায় আবেগকে পোষমানা প্রাণী করে তোলেননি।

* * *

ত্রুবাদুরদের মতো বৈষ্ণব কাব্যধারাও, লোকজীবন-ধৃত কাব্য-সঞ্চয় আর জাতির স্মৃতিলোকে ধৃত প্রেম-কাব্যের ধ্রুব-সম্পদ—এই উভয়ের কাছ থেকে শক্তি আর

লাবণ্য ভিক্ষা করে বড়ো হয়ে উঠেছে। ইওরোপের মধ্যযুগীয় দরবারী প্রেম গাথাতেও দেখা যায় যে কখনো বিস্মৃতপ্রায় কেল্টিক উৎস থেকে, কখনো বা হিব্রু বা আরবীয় উৎস থেকে অতি ক্ষীণ প্রাণধারাটুকু সংগ্রহ করে, Tristan and Iseult-এর আখ্যান অথবা প্রেমমূলক গীতিকবিতার অন্য শাখা—যত দিন গেছে তত দেশজ ফলে-ফুলে-পল্লবে, লোকগাথায়, জনরঞ্জনী কাহিনীতে, ব্যঙ্গে, বাক্‌নৈপুণ্যে, তাদের নিজস্ব শ্রী-সম্পদের বিকাশসাধন করেছে। বৈষ্ণব কবিতার বিষয়বস্তুতেও এই দুই প্রান্তের দান কম নয়। আবহমানকাল ধরে ভারতবর্ষের প্রেম কবিতায়, রাধাপ্রেমের মোটামুটি আদর্শের যে ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল—বৈষ্ণব কবিবৃন্দ সে ইঙ্গিতকে অনুসরণ করে রসোৎকর্ষ সাধন করেছেন নিজ নিজ কাব্যে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়, তাঁর "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে" নামক গ্রন্থে 'বৈষ্ণব প্রেম কবিতা ও প্রাচীন ভারতীয় প্রেম কবিতার ধারা'-শীর্ষক অধ্যায়ে বাংলার বৈষ্ণব কবিদের এই ভারতীয় উৎসমুখটির সবিশেষ আলোচনা করেছেন। তিনি হালের গাহা-সত্তসঈ থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত করে চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে তার তুলনা দেখিয়েছেন।—

ণইউরসচ্ছহে জোব্বণম্মি অইপবসিএসু দিঅসেসু।
অণি অত্তাসু অ রাঈসু পুত্তি কিং দড্ঢমাণেণ॥ ১।৪৫

(আহা রমণীর যৌবন নদী জল,
দিনগুলি যায় চিরকাল চলে যায়,
রাত্রিও আর ফিরে আসে না কো হায়—
বৃথা অভিমানে কী ফল লভিবি বল্॥)*

শশীবাবু চণ্ডীদাস থেকে যে আশ্চর্য প্রতিতুলনাটি ব্যবহার করেছেন সেটি এই :

কাল বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি॥

---

* কাব্যানুবাদ সম্পাদকের।

জোয়ারের পানি নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার॥

আর একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন শশীবাবু—বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদে যার পরিচিত প্রতিধ্বনি :

রথাপইন্নণঅণুপ্পলা তুমং সা পড়িচ্ছএ এন্তম্।
দারণিহিএহিঁ দোহিঁ বি মঙ্গল কলসেহিঁ ব থণেহিঁ॥ ২।৪০

(আসবে তুমি, তাই তার এ মঙ্গল আচার-আয়োজন,
তোমার আসা-পথে রেখেছে মেলে তার কমল দু-নয়ন,
দুখানি স্তন যেন দুয়ারে মঙ্গল-কলসে স্বাগতম্॥)*

বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদটি এই :

পিয়া জব আওব ই মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহু করব নিজ দেহে॥
কনআ কুম্ভ করি কুচ জুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥

এইভাবে রসজ্ঞ সমালোচক দেখিয়েছেন রাধার বিরহে, রাধার প্রতীক্ষায়, ওদিকে পূর্বরাগে এবং অভিসারে প্রাকৃত-কাব্যের নায়িকাদর্শ কেমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে, জ্ঞানদাসে এবং গোবিন্দদাসে প্রেমের নানা অভিব্যক্তিতে তারই ছায়া। এক দুই করে দিবস গণনা করতে হাতের এবং পায়ের আঙুল শেষ হয়ে গেল এখন কী হবে, অথবা দেওয়ালে দাগ কাটতে গিয়ে সারা দেওয়ালই চিত্রাঙ্কিত হয়ে গেল, তবু তার দেখা নেই, —প্রভৃতি উক্তিতে কিংবা অভিসারের পথপরিক্রমা শিক্ষার সুবিখ্যাত পদে কখনও গাহা-সত্তসঈ, কখনও অমরুশতক কখনও বা অপর কোনো রচনা আদর্শ হিসাবে কাজ করেছে।

* কাব্যানুবাদ সম্পাদকের।

কিন্তু এখানে এ-কথা মনে করলে ভুল হবে যে কাব্য-সংস্কারগুলিকে যথাপ্রাপ্ত অবস্থায় ব্যবহার করে বৈষ্ণব-কবিবৃন্দ তাঁদের কবি-কর্তব্য সমাধা করেছেন। বরঞ্চ দেখা যায় তাঁরা প্রাপ্ত আদর্শের ইঙ্গিত থেকে বহু ক্ষেত্রে কাব্যোৎকর্ষের দিকে অগ্রগামী হয়েছেন। অমরুশতকে ও কবীন্দ্র-বচন সমুচ্চয়ে অভিসারের রাত্রে দুর্যোগ-দুস্তর পথ-পরিক্রমার পাঠ গ্রহণের পদের উৎকর্ষ সাধন হয়েছে গোবিন্দদাসের সুবিখ্যাত অভিসার-শিক্ষার পদে—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

কিংবা—

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর-পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥

চলতহি অঙ্গুলি চাপি—ছবি হিসাবে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ও সার্থক। দূতর-পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে—এই চরণের ধ্বনি-তরঙ্গে যেন রাধার দুরু দুরু বক্ষের প্রতিধ্বনি। কোনো পদে পাওয়া যায়:

পত্তনিঅম্বপ ফংসা ন্হাণুত্তিণ্ণাএ সামলঙ্গীএ।
জল বিন্দু এ হিঁ চিহুরা রুঅন্তি বন্ধস্স ব ভএণ॥

স্নানান্ত-তরুণীর মুক্ত চিকুর রাশি নিতম্বের ওপর পড়েছে; যেন ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়ে, পুনরায় বন্ধনের ভয়ে তারা রোদন করছে—এমন ছবিতে খুব উঁচু দরের কবি-কল্পনার প্রকাশ ঘটেছে তা বলা যায় না। কিন্তু এখানকার ইঙ্গিতকে কল্পনার দিব্য আলোকে স্ফুটতর করে এমন পংক্তি রচনা করেন বৈষ্ণব কবি, যা শ্রেষ্ঠ কবির স্বাক্ষরে চিহ্নিত।—

নাহিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
পড়েছে চিকুর রাশি।
কালিয়া আঁধার কনক চাঁদার
শরণ লইল আসি॥

প্রথম চরণে যেন আদর্শ-নির্দিষ্ট বর্ণনারই যথাযথ অনুসরণ। কিন্তু দ্বিতীয় চরণে —কালিয়া আঁধার কনক চন্দ্রের শরণ প্রার্থনা করছে—এ বর্ণনা যেমন কল্পনা-সিদ্ধ, তেমন রূপ-দ্রষ্টার হৃদয়ের আকুল স্পন্দনে মথিত। এই আশ্চর্য কবি-বচনে শুধু অর্থালংকারের কৃতিত্বের নিদর্শনই অনুসন্ধেয় নয়, প্রাচীন কাব্যের আদর্শে পুষ্ট কবিমানসের স্বাধীন পদক্ষেপের রসোজ্জ্বল নিদর্শন বলেই এর মূল্য অধিকতর।

এইভাবে দেখানো চলে যে সমগ্র বৈষ্ণব কবিতার প্রেমের পরিমণ্ডলে ভারতবর্ষের প্রেমের কবিতার প্রাচীন ধারার প্রসাদ লভ্য। যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্বগত প্রভাব তার ওপর প্রত্যক্ষ হয়েছে তখনও সে প্রেমের ছায়া-সহচর হিসাবে মানবিক প্রেমের আদর্শ প্রগাঢ় সৌন্দর্য সৃজন করেছে। এবং এও সত্য যে যেখানে বৈষ্ণব-কাব্য কালজয়ের শক্তিতে শক্তিমান, সেখানে তত্ত্বের প্রত্যক্ষ-প্রভাব-নিরপেক্ষভাবে সে মৃত্যুঞ্জয়। তত্ত্ব সে মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমার সূক্ষ্ম আত্মায় বিরাজিত, কিন্তু তার দেহে, লাবণ্যে এবং তাৎপর্যে মানবিকতার চূড়ান্ত জয় ঘোষিত। তাই বৈষ্ণবের রাধা যেন "ভারতীয় কবি-মানস-ধৃত নারীরই একটি বিশেষ রসময় বিগ্রহ।" প্রেমের যন্ত্রণার অগ্নিদাহে যে চির-শুদ্ধা নারীকে আমরা সীতা-সাবিত্রী অপেক্ষা হৃদয়ের উচ্চতর মঞ্চে আসন দিয়েছি—তিনিই রাধা—সমগ্র বৈষ্ণবী প্রেমের প্রতীক।

> "সাহিত্যের দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে বৈষ্ণব সাহিত্যের বহু স্থানে এই প্রাকৃত মানবী রাধাই কায়া মূর্তি, বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত রাধা তাঁহার অশরীরী ছায়ামূর্তি। অথবা বলিব প্রাকৃত মানবীরই ঘটিয়াছে প্রতিষ্ঠা—তাহার উপরে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের ক্ষণে ক্ষণে ছোঁওয়া লাগিয়াছে।"
> —(শশিভূষণ দাশগুপ্ত)

> "এক কথায় যে কোনো কালে যে কোনো নায়িকা প্রেমের পথে চলিয়া যে সকল অমানুষী গুণ দেখাইয়াছেন—রাধা তাঁহাদের সকলের প্রতীক। ...শত শত সতী চিতায় পুড়িয়া যে ছাই হইয়াছে—সেই চিতার পূত বিভূতি হইতে রাধিকার উদ্ভব। সেই সকল 'সতী' ও নায়িকা হব্য-স্বরূপ, কিন্তু যখন সেই হব্য হোমাগ্নির আহুতি হয় তখন তাহার নাম রাধা-ভাব।"—(দীনেশচন্দ্র সেন)

* * *

সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় যে গাহা-সত্তসঈ, অমরুশতক, কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয় যেমন বৈষ্ণব কবিতার প্রেম-ভাব-সত্তার এক প্রান্তকে ধারণ করে রেখেছে, তেমনি তার আর এক প্রান্তের অলক্ষ্য আত্মিক যোগ রয়েছে বাংলাদেশের নদী-প্রান্তরচারী ও গ্রামীণ রাখালিয়া প্রেমেব গীতি-কাহিনীর সঙ্গে। এই পল্লী প্রান্তর থেকে বৈষ্ণব কবিজনেরা দুটি বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করেছেন। এক, কাব্যধৃত নায়িকাদর্শে বাস্তব সংসারের মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন বৈষ্ণব কবিরা বাস্তব সংসারের জল হাওয়া লাগিয়ে কাব্যধৃত প্রতিমাটির স্থানীয় রঙ ফোটালেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। এইখানে দেশজ নদী-প্রান্তরচারী ও রাখালিয়া প্রেমের গীতি-কাহিনীর সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তা। দুই, নদী-নির্ভর গ্রাম-জীবনযাত্রাকে প্রেমের পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে, নদীসূত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতির বিভিন্ন মূর্তিকে বৈষ্ণব কবিরা উপলব্ধি করলেন। এ-ক্ষেত্রেও গ্রাম্য প্রেম-গীতিগুলির সঙ্গে বৈষ্ণব কবিবৃন্দের গভীর মিল লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে কে কাকে কতটা প্রভাবিত করেছে বলা কঠিন। কেননা উভয় ক্ষেত্রেই সাল তারিখের বিবাদ অমীমাংসিত। এ-প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন : 'এই মিলগুলি একের উপরে অপরের প্রভাব-জনিত না হইয়া, ইহাই হয়তো সত্য যে বাংলাদেশের বিশেষ একটি জীবনধারা-এবং সেই জীবনে প্রেমেরও একটা বিশেষ ধারা ছিল,—সেই প্রেম-প্রকাশেরও আবার কতগুলি বিশেষ ভঙ্গি ছিল। সেই ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গি একটা সাধারণ জাতীয় উত্তরাধিকাররূপে বৈষ্ণব কবিতা ও অন্য প্রেম-গীতিকা সকলের ভিতরেই দেখা দিয়াছে।" আমাদের মনে হয় যে, উভয়েই যে ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গিব জাতীয় উত্তরাধিকার বহন করেছেন, তারও একটি লোকজীবনগত কাব্যমূল কোথাও ছিল। বিশেষ কাব্য রচনা নিয়ে সাল তারিখের বিবাদ চলতে পারে। কিন্তু কবে যে এরা কোন্ অখ্যাত কবিকণ্ঠে, কোন্ অজ্ঞাত গ্রামপ্রান্তে প্রথম প্রস্ফুটিত হয়েছিল, তার পর লোকের মুখে মুখে "ফুলের মতো" ছড়িয়ে পড়েছিল—তা ইতিহাসের নাগালের বাইরে। মনে হয় সেই কাব্যমূল থেকেই বৈষ্ণব কবিবৃন্দ তাঁদের নায়িকার প্রেমের যন্ত্রণার চেহারাকে বাস্তব করে তোলার উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন। কাব্যাদর্শের

প্যাকিং বাক্সে রাখা নায়িকার প্রতিকৃতিতে নিজস্ব রঙ ফুটিয়ে তুলতে হলে খোলা হাওয়া লাগানো দরকার। সেই হাওয়ায় চিরকালের দীর্ঘশ্বাসের রেশ। কিন্তু সেই দীর্ঘশ্বাসে জীবনের স্পন্দন।—

বন্ধু আজ তোমারে স্বপন দেখি রাইতে।
লোক লাজে সময় পাই না কইতে॥
আমি যে অবলা নারী   মনের কথা কইতে নারি
চক্ষের জলে বুক ভেসে যায় বালিশ ডাকে শুতে
                    সময় পাই না কইতে॥
মনের মানুষ পুজবাম বইলা গাঁথলাম বনমালা।
কাল বিধাতা বাদী হইল আমার ছুটলো বিষম জ্বালা॥
                    (গো সখী) সময় পাই না…
(আমার) চন্দন বনে ফুল ফুটিল গন্ধের সীমা নাই।
কোন্ দৈবেরে দিল আগুন আমার সকল পুইড়া ছাই॥
                    (গো সখী) সময় পাই না…

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথম, ঠিক এই ধরনের ঋজু-বাচনে লোক-কবিরা হৃদয়ের আকূতিকে যতটা সজোরে ঘোষণা করতে পারতেন, ততটা অনুভূতিকে রসে-রূপে সার্থক কাব্যশরীর দান করতে পারতেন না, সারল্যের সম্পদে ও লাবণ্যে প্রায়ই হৃদযের আবেদনকে গানের অনুরণনে পৌঁছে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন। দ্বিতীয, সখী-পরিবৃতা রাধাব যন্ত্রণায় অনেক সময় মনে হয়েছে রাধার বেদনার বহু দরদী-অংশীদার থাকার ফলে সে বেদনা যেন অনেকটা লঘু হয়ে গিয়েছে। লোক-কবিবা সে-ক্ষেত্রে তাঁদের নায়িকাকে প্রায়ই যন্ত্রণার ক্ষেত্রে একাকিনী করেছেন। ফলে যন্ত্রণাবোধের তীব্রতার সঙ্গে তীক্ষ্নতা এসে যুক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিবা এই দুই প্রান্ত থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সারল্যকে তাঁরা কবিত্বের সূক্ষ্ম স্বর্ণতন্তুতে জড়িত করেছেন—বিচিত্র ও ব্যাপক মানস-অভিজ্ঞতাকে সে সারল্যের সঙ্গে যুক্ত করে, তাকে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিবৃন্দের প্রেমোক্তির সমকক্ষ করে তুলেছেন। এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ একাকিনী নায়িকার মূল্যকে উপলব্ধি করে তাঁরা রচনা করেছেন আক্ষেপানুরাগ—সেখানে রাধার বেদনার অংশভাগী কেউ নেই। সেখানে সে একাকিনা। সে নৈঃসঙ্গ্যে তার আত্মার দীপ্তি।

গ্রাম-প্রকৃতির পটে স্থলয় রাখালিয়া প্রেম-গীতিকা থেকে আর এক শিক্ষা নিয়েছেন বৈষ্ণব কবিরা। সেখানে প্রেমের সরল বেদনাই কাহিনীর আধারে প্রধানত পরিবেশিত হয়েছে। প্রকৃতির সেখানে বিশিষ্ট ভূমিকা নেই। মাছের কাছে জলের মতো—জলকে সেখানে পৃথক করে ফেলা যায় না। প্রাকৃত নায়িকার কাছে প্রকৃতি কোনো জীবন্ত দ্বিতীয় সত্তা নয়। বৈষ্ণব কবিরা সে ক্ষেত্রে বাংলা লোক-কাব্যে ব্যবহৃত নদী, নদীকূল, জলকে চলা, মেঠো বাঁশি এবং কদম্বের তমালের কেশর-শিহরণ ও ছায়াঘনতা, সমস্ত-কিছুর সহায়তায় একটা প্রকৃতি চেতনা গড়ে তুলেছেন। সমগ্র প্রকৃতিতেই তাঁরা শুনতে পেয়েছেন আনন্দের এবং যন্ত্রণার সেই ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

> বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষাকালের যমুনা বর্ণনা মনে পড়ে—প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়—তার প্রধান কারণ, এই সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়—এর মধ্যে মানব-ইতিহাসের যেন সমস্ত পুরাকালীন প্রীতিসম্মিলন গাথা পূর্ণ হয়ে রয়েছে. এর মধ্যে যেন একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের সেই অনন্ত বৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণব কবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।

মেঘাবৃত দিবস-রজনী, জ্যোৎস্না-হসিত আকাশ, ফাল্গুনের কুসুমিত অরণ্যানী এই সমস্ত-কিছু যে শুধু প্রেমের উদ্দীপন বিভাব মাত্র নয়, এ-যে হৃদয়েরই প্রতিধ্বনি, অথবা নিত্য বৃন্দাবনের ছায়া যে এখানেই পড়ে, বৈষ্ণব কবির প্রকৃতিমুখিনতায় সেই বোধ প্রতিফলিত। ঝড়ের নদী, পাখি-ডাকা কানন ভূমি অথবা বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ রাত্রি, প্রেমের আনন্দ-যন্ত্রণার চলিষ্ণু ছোঁওয়ায় জীবন্ত। এবং এ এমনভাবে আমাদের স্মৃতিলোককে অধিকার করে রেখেছে যে, যে-কোনো দিনে মেঘের পরে মেঘ জমে আঁধার করে আসলেই মনে হয় আমরা সকলে যেন চিরবিচ্ছেদের দায় বহন করছি, মনে হয়, কৈসে গোঙায়ব, কৈসে গোঙায়ব। বিশেষ করে অভিসারের পদে, যেখানে পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা ভাবে-রসে বৈষ্ণব কবিবৃন্দ কল্পনার অখণ্ড রূপ সৃজন করতে পেরেছেন, সেখানে ছন্দোতরঙ্গে রাধার চকিত চরণের লঘু চঞ্চল গতিকে প্রকৃতির পরিবেশে যেন অন্তহীন যাত্রার রূপক বলে মনে হয়। প্রকৃতি সেখানে যেন

বাধাও নয়, প্রেরণাও নয়। সে যেন মানস সুরধুনীর পারে চিরযাত্রার অন্তহীন প্রয়াসের সাধনপীঠ। আশ্চর্যভাবে নানা বিচিত্রতায় প্রকৃতির হাসি-কান্নার কথা ব্যবহৃত হয়েছে। নদীবক্ষে ঝড়ে টলমল নৌকার বর্ণনা যেমন বাস্তব, তেমন বাস্তব জ্যোৎস্না-মাখা কুহেলিকাচ্ছন্ন শীতের রাত্রির বর্ণনা।

* * *

এই ভাবে অগ্রসর হতে-হতে বৈষ্ণব কবিতা ক্রমশ সংগ্রহ করেছে সেই শক্তি যার মধ্যে আছে কালোত্তরণের উপাদান। মানুষের মন সম্বন্ধে অশেষ আগ্রহ এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে নিবিড় সহানুভূতির সংমিশ্রণে, কল্পনার দিব্য স্ফুরণে, এই কবিবৃন্দ এমন সব আন্তরিক কবিবচনের জন্ম দিয়েছেন "যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যেই মেলে।" এই সমস্ত কবিবচনের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিবৃন্দ আর কারো অধমর্ণ নন—পরবর্তীকালের উত্তমর্ণ। দেশজ কাব্য-স্রোত এবং প্রাচীন কালাগত কাব্যাদর্শ, এই দুয়ের সাহায্যে যে-প্রেমের অম্লান মূর্তি রচিত হল, নিজ অভিজ্ঞতার অতলস্পর্শ সমুদ্র থেকে মুক্তা আহরণ করে তার গলায় দুলিয়ে দিলেন কবিবৃন্দ। তারপরে ভাবদৃষ্টির সাহায্যে করলেন তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এ-কবিরা যখন বলেন 'যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল' কিংবা যখন বলেন 'এক অঙ্গে এত রূপ কখনও না ধরে' তখন তা স্বীয় কল্পনা-প্রদীপ্ত চরণ। এখানে তারা অপরাজেয়। বৈষ্ণব কবিরা যখন অনুভূতিকে নব আবিষ্কার কবেন তখন চমকিত হতে হয় তার প্রথাবিমুক্ত সাহসিকতায়। রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।—এমন সাহসিক উক্তি। ক্রীড়াচঞ্চল রাধাকে দেখে সৌন্দর্যমুগ্ধ কৃষ্ণের অপরিচয়ের বেদনা-মথিত উক্তি যেন চিরকালের প্রেমিকের কথা—দেখ সখী কো ধনি সহচরী মেলি। আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি। তার খেলা দেখে মনে হচ্ছে সে যেন আমার জীবন নিয়ে খেলা করছে—এ-মনোভাবে উন্মেষিত অধীর প্রেমের বিচিত্র ছায়া। তেমনি, এতেক সহিল অবলা বলে, ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে—ব্যাখ্যার অগম্য সার্থকতায় সমৃদ্ধ। রাধা যখন বলেন আমি মরে যাব, কিন্তু ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমে মিশে থাকবে আমার প্রেমজ্যোতি—তখন শুদ্ধতা নেমে আসে প্রগল্‌ভতম হৃদয়ে—বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় রাধার মহাভাব স্বরূপকে। যখন বাদল রাত্রির পটভূমিকায়

অভিসারিকা গৌরাঙ্গিনী রাধাকে দু-এক আঁচড়ে জীবন্ত করে তোলেন বৈষ্ণব কবি, তখন সে অসামান্য রূপ সৃজন দেখে আমাদেরও বলতে সাধ যায় 'চয়ণ কি বলিহারি।' আর কী আশ্চর্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, গ্রীষ্মদেশের সুগৌরী তরুণীর স্বেদাক্ত মুখশ্রীর বর্ণনাতেও ভুল নেই—বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে প্রেমসিন্ধু প্যারী। ঈশ্বরের রহস্য হয়তো ভেদ্য। কিন্তু বৈষ্ণব কবিই বললেন প্রেমের বিস্ময় অভেদ্য। সেখানে ঘরকে বাহির করে, বাহিরকে ঘর বলে, পরকে আপন করে, আপনার সব-কিছুকে পর বলে, দিনকে রাত্রির মতো আঁধার ভেবে, রাত্রিতে দিনের মতো নিঃশঙ্ক হয়েও সে রহস্যের তল পাওয়া যায় না। এখানে প্রেম যেন ঈশ্বরেরও ওপরে ঠাঁই পেয়েছে। এ-কথা বৈষ্ণব কবির মতো কেউ বলেননি। কেননা তাঁদের মতো কেউ বোঝেননি। এই উপলব্ধির অনন্যতায় সেই কবিদের কাল-বিজয়। এইখানে তাঁরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এইখানে তাঁরা যে আসন পেতেছেন তার সপ্রেম আমন্ত্রণে ঈশ্বরও লোভার্ত হয়ে পড়েন। আমাদের বর্তমান সংকলনে, প্রেমের সেই তীব্র স্রোতোময় যমুনা-ধারার কথঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণের প্রয়াস। এ-সংকলনে বৈষ্ণব পদাবলীর সংখ্যাগত নিঃসীমতাকে দুই মলাটের মাঝখানে ধারণ করার প্রচেষ্টা হয়নি। হয়তো দু-একটা গুণের দিক থেকে উৎকৃষ্ট পদও বাদ পড়ে যেতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য, আধুনিক মনের উপযোগী করে, পালাগানের কথা মনে রেখে—রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ব্যাপারটিকে একটি কাহিনীর সূত্রে গ্রথিত করা। পদাবলীর এক-একটি পদ যেন রচিত মাল্যের এক-একটি মুক্তা। সূত্র কল্পনা-টুকু সম্পাদকের নিজের। অবশ্যই সে সূত্র-কল্পনা বৈষ্ণবের আদর্শকে লঙ্ঘন করেনি। দু-একবার ঈষৎ স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি বটে—যেমন রাসের ও ঝুলনের আগে আর একবার নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনার ব্যবহার—কিন্তু তা নিশ্চয় মূলকে আঘাত করেনি। এইভাবে কাহিনী সূত্রে গাঁথা হয়েছে বলেই কবিদের কালানুক্রম বজায় রাখার প্রয়োজন হয়নি—কবিদের পৃথক পৃথক স্থান-বিন্যাসও পরিহার করা হয়েছে। বৈষ্ণবের প্রেমে প্রেমের যন্ত্রণার রূপ প্রধান বলে, পূর্বরাগ, অভিসার, মান, রূপোল্লাস, রসোদ্গার, মাথুর প্রভৃতি নামাঙ্কিত অধ্যায়-কল্পনা কাহিনী-গ্রন্থনে পরিহার্য মনে হয়েছে। তাই বৈষ্ণব কবিদের ব্যবহৃত কাব্যাংশের সাহায্যে অধ্যায় কল্পনা করা হল। কাহিনীর প্রয়োজনেই বিহার ও প্রতি-বিহারের পদ বাদ দেওয়া হয়েছে।

* * *

ভারতবর্ষে নারী ভালবাসলেই রাধা। যাকে ভালবাসা যায় সে সব সময় কৃষ্ণের মতোই দুর্লভ। আমরা এমনই ভাবে এই ভালবাসার ধর্মে জারিত যে যখন দেশের স্বাধীনতা চেয়েছি, তখন স্বাধীনতার জন্য আকুল প্রতীক্ষাকেও মনে হয়েছে কৃষ্ণের জন্য রাধার প্রতীক্ষা। 'অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কই' বলে বঙ্কিমের আক্ষেপে সেই প্রতীক্ষার বঁধু-মূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণব প্রভাব নেই সেখানেও ছায়ায় ছায়ায় এই কবিদেরই কল্পতরুর মর্মর। জল্‌কে যাবে যে মেয়ে সে যখন বলে : আমি বাহির হইব বলে যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে নীল আকাশের কোলে— তখন মনে হয় এ-আমাদের জানা কথা। মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিকতম কবি পর্যন্ত সকলেরই সৃষ্টির যন্ত্রণা রাধার তীব্র প্রতীক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত, দীক্ষিত যন্ত্রণা বহনের শিক্ষায়। বর্তমান সংকলনে প্রেমের সেই যন্ত্রণা-ঘন আনন্দকেই প্রধান বলে ভাবা হয়েছে।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল
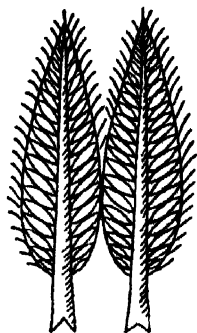
বিবশ দিন বিরস কাজ

কে কোথা ছিনু দোঁহে।

সহসা প্রেম আসিল আজ

কী মহা সমারোহে ॥

১

ধনি কানড় ছান্দে বান্ধে কবরী।
নবমালতী মাল তাহে উপরি ॥
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী।
খেনে উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী ॥
ধনি সিন্দুর বিন্দু ললাট বনি।
অলকা ঝলকে তঁহি নীলমণি ॥
তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙপাতা।
ভুরু ভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গলতা ॥
নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা।
তাহে কাজর শোভিত নীল ছটা ॥
তিলপুষ্প সমান নাসা ললিতা।
কনকাতি ভাতি ঝলকে মুকুতা ॥
ধনি সুন্দর শারদ ইন্দুমুখী।
মধুরাধর পল্লব বিম্ব লখি ॥
গলে মোতিমহার সুরঙ্গ মালা।
কুচকাঞ্চন শ্রীফল তাহে খেলা ॥
নবযৌবন ভার ভরে গুরুয়া।
যঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া ॥
ক্ষীণ উদর পাশে শোভে আলতা।
মণিমঞ্জরী তোড়লমল্ল পাতা ॥
নখচন্দ্রছটা ঝলকে অনুপাম।
হেরি গোবিন্দদাস তঁহি পরণাম ॥

সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন বিরহমিলন গীতিকা রচনার কালে নায়িকা এবং নায়কের রূপশ্রী বর্ণনাকে কখনোই মহাজন পদকারেরা গৌণ করে রাখেননি। যে-রূপ দেখলে মনে হয় জন্ম-জন্মান্তর বেঁধে দেব এর

পায়ে—সে রূপকে বাণীবদ্ধ করা অবশ্যই দুরূহ। কিন্তু বৈষ্ণব পদকারেরা রূপকে আনন্দরসের আধার বলে দৃঢ় প্রতীতি অর্জন করেছিলেন। তাই রূপের বর্ণনায় আত্মহারা কবি যখন শেষ চরণে প্রণাম নিবেদন করেন সেই অসামান্যা রূপবতীর চরণে, তখন তা ধর্মবিশ্বাস-নিরপেক্ষ ভাবেই পৌঁছে যায় রূপাতীতের পদতলে। সৌন্দর্যের উদ্দেশে এই আকুতিটুকু রয়েছে বলেই উপমায় সংস্কৃত ক্ল্যাসিকের অনুস্মৃতি সত্ত্বেও ছন্দের স্তোত্রতুল্য ঝংকারে এসেছে একটা বিশিষ্টতা। নীলোৎপলের মতো তাঁর কবরী, তাকে ঘিরে রয়েছে নব-মালতীর মালা। তাঁর সিঁদুরের টিপ পরানো কপালে নীল চন্দনের চিত্র। বাঁকা সাপের মতো বঙ্কিম তাঁর ভ্রূভঙ্গিমা। চোখে খঞ্জন পাখির চাঞ্চল্য। স্বর্ণবর্ণ শ্রীফলের ন্যায় তার স্তনযুগলের উপর সুন্দর লাল মালার স্পর্শ। অঙ্গে নবযৌবনের গুরুভার। পায়ে মণিখচিত মল্লতোডল।

২

অতি সুমধুর মধুর শ্যাম
কুটিল কেশ কুন্তল দাম
মউরপক্ষ শোহনি।
ভাল উপরে চঁদনবিন্দু
অমল শরদ পূর্ণিমা ইন্দু
ভুবন মরম মোহিনী॥
আজি পেখলুঁ তরণীতীর
মদনমোহন গতি সুধীর
মুরলীগীত কে ধরু চিত
আনন্দে উলটি বহত নীর॥
কম্বুকণ্ঠে কনকমাল
গজমোতিম গাঁথি প্রবাল
বিবিধ রতন সাজনি।
প্রাতকমল নয়নজোড়
মাঝে মধুপ রহ আগোর
রমণীরমণ চাহনি॥
উচ উর পর কুসুমদাম
রূপ নিরুপম পূজল কাম
কটি পীততট কাছনি।
ভুবন বিচিত্র এ অঙ্গ ঠাম
বিধিক অবধি ও নিরমাণ
জ্ঞানদাস যাঙ নিছনি॥

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল"—এমন রূপের পাথার না হলে নায়িকার প্রেমের শতদল কোথা থেকে সংগ্রহ করবে তার সৌরভ? এখানেও কবি জ্ঞানদাস সেই ভুবনবিচিত্র ঠামের—সেই অপরূপ লাবণ্যের পদতলে

নিজেকে উৎসর্জিত বলে ঘোষণা করেছেন। আগের পদটিতে গোবিন্দদাসের রাধা-প্রণাম এবং এই পদটিতে জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ-প্রণাম, মূলত সৌন্দর্য-প্রণাম। এই পদটিতে কৃষ্ণের ললাটের চন্দনবিন্দুর তুলনা দেওয়া হয়েছে পূর্ণিমার শারদ-চন্দ্রের সঙ্গে। নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ যেমন আকাশকেই উদ্ভাসিত করে, চন্দনের ফোঁটাও তেমন উদ্ভাসিত করেছে সেই তরুণকে। তাঁর কুঞ্চিত কেশে ময়ূর-পুচ্ছের শোভা—ধীরগামী সে তরুণ নায়ক বাঁশিতে সুর তুলে যমুনার জল উজানে বইয়ে দিচ্ছেন। প্রভাতবেলার সদ্যপ্রস্ফুট সতেজ পদ্মের ন্যায় তাঁর আঁখিযুগল।

কল্পনা করা যাক যে আমাদের মন-বৃন্দাবনের, নিত্যকালের এই দুই নায়ক-নায়িকার একদিন সাক্ষাৎ ঘটেছিল। স্নানার্থিনী তরুণীর বিপুল সৌন্দর্যের আচম্বিত বিকাশে নায়ক আলোড়িত-চিত্ত, সে তখন বলে :

৩

সখা হে সে ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥

কিবা সে তুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
মাজিতে উদয় শুধু সুধাময়
দেখিয়া হইনু ভোলা॥

নাহিয়া উঠিতে নিতম্ব-তটীতে
পড়েছে চিকুর-রাশি।
কালিয়া আঁধার কনক চাঁদার
শরণ লইল আসি॥

চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরান সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে স্থির
মনমথ জ্বরে ভোর॥

এ দাস লোচন কহিছে বচন
শুনহ নাগর চান্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥

আমরা জানলাম কে আমাদের প্রিয় নায়িকা—সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী—নাম বিনোদিনী রাধা। এই পদ আশ্চর্য চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ। স্নানান্তে বিলোল চিকুররাশি থেকে বিন্দু-বিন্দু জল ঝঁরে পড়ছে, এ যেন চাঁদের কাছে অন্ধকারের কান্না। যে কোনো সৌন্দর্যের পূর্ণবিকাশের সম্মুখে চিত্তের এই

বিগলিত অবস্থা বিগলিত চিকুরের সঙ্গেই তুলনীয়। কবি-কল্পনাকে যুগে যুগে তা আকৃষ্ট করেছে। তাই চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিতে মোর —এ প্রেমেরও পূর্বাভাস, বেদনারও পূর্বাভাস।

কাজেই চোখের দেখা ধীরে ধীরে নায়কের কল্পনার দেখাকে তীব্র এবং সূক্ষ্ম করে তুলেছে। নায়কের স্বগত আলাপে তারই প্রতিধ্বনি :

৪

অপরূপ পেখলুঁ রামা।

কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল

হরিণ হীন হিমধামা॥

নয়ন নলিনীদৌ অঞ্জনে রঞ্জল

ভাঙু বিভঙ্গি বিলাস।

চকিত চকোর জোবে বিধি বান্ধল

কেবল কাজর পাশ॥

গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশত

গিম গজমোতিম হারা।

কামকম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি

ঢারত সুরধুনি ধারা॥

পয়সি পয়াগে যাগ শত জাগই

সো পাওয়ে বহু ভাগী।

বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক

গোপীজন অনুরাগী॥

পূর্বের পদটিতে যে আকৃতির সাক্ষাৎ পেয়েছি তা অবশ্যই এই পদটিতে নেই। কিন্তু রূপ উপভোগের স্বগতোক্তিতে যে বর্ণনা চাতুর্য ক্ষণে ক্ষণে বিশিষ্ট কবিবচনেব জন্ম দেয়, সে উপভোগের প্রসাদ এখানে বিদ্যমান। 'কাজলের পাশে চকিত চকোর পাখি দুটিকে বেঁধে রাখা হয়েছে' এই জাতীয় কবি-উক্তি। স্তনের সঙ্গে কনক শম্ভুর উপমা যদিবা বহু ব্যবহৃত, প্রয়াগের শত-যজ্ঞ-সাধকের ভাগ্যেই এ রমণীরত্ন সুলভ—এই উক্তিতে নায়কের হৃদয়স্পন্দনকে ধরা যায়। ওদিকে কনকলতা যাঁর শরীর—যে শরীর ধারণ করে রেখেছে নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মতো তাঁর মুখশ্রীর দ্যুতিকে, সেই অপূর্ব শরীরিনী রাধাও হয়েছেন প্রথম প্রেমের আঘাতে বিহ্বল। 'সহসা প্রেম আসিল আজ কী মহা সমারোহে'—পরম আবেগে কবি এঁকেছেন সেই রূপ-পূজারিনীর বিহ্বলতাকে।

৫

দরশনে উনমুখী　　　　　　দরশন-সুখে সুখী
আঁখি মোর নাহি জানে আন।
যাহাঁ যাহাঁ পড়ে দিঠি　　　　　　তাহাঁ অনিমিখে ছুটি
সে রূপ-মাধুরী করে পান ॥
মধুর হৈতে সুমধুর　　　　　　মধুর অমিয়াপূর
মধুর মধুর মৃদু হাস।
চঞ্চল কুণ্ডল-আভা　　　　　　ঝলমল মুখ-শোভা
দেখিতে লোচন অভিলাষ ॥
কহিতে রূপের কথা　　　　　　মরমে পরম ব্যথা
লাখে বিধি না দিল বয়ান।
দেখে আঁখি কহে মুখ　　　　　　তাতে কি পুরয়ে সুখ
তাহে বড়ো রসের পরান ॥
দেখে আন কহে আন　　　　　　অনুভবে অনুমান
তাহে কি পরান পরবোধ।
কহিতে না পারি দেখি　　　　　　অতয়েব ঝরে আঁখি
শ্যামদাসের মরম-বিরোধ ॥

বারেক দর্শনের পরে রাধার সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হয়ে রয়েছে আবার তাকে দেখবে বলে। রাধার আক্ষেপ এই যে সেই উজ্জ্বল মুখশ্রী, সেই চঞ্চল কুণ্ডল-আভা, সেই পরম রূপমাধুরী তিনি এক মুখে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। তিনি দুঃখ করে বলছেন, বিধাতা যদি তাঁকে লক্ষ মুখ দিতেন তবে লক্ষ মুখে ব্যাখ্যা করতেন তার রূপ। চোখ তো শুধু দেখতে পায়, আর মুখ তো শুধু বলতে পারে। একজনের দেখা আর একজনের বলা—এতে কখনো সে রূপের পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব ?

৬

সহজই বিষম অরুণ-দিঠি তাকর
আর তাহে কুটিল কটাখ।
হেরইতে হামারি ভেদি-উর-অন্তর
ছেদল ধৈরজ-শাখ॥

এ সখি, বিহরয়ে কো পুন এহ।
পীত বসন জনু বিজুরী বিরাজিত
সজল জলদ-রুচি দেহ॥

মৃদু মৃদু ভাষি হাসি উপজায়ল
দারুণ মনসিজ-আগি।
যাকর ধূমে ধরম-পথ কুলবতী
হেরই বহু পুন ভাগি॥

তহিঁ পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই
দহইতে গৌরব লাজ।
কহ ঘনশ্যাম দাস ধনি ঐছন
আনহ হৃদয়ক মাঝ॥

তার আরক্তিম চোখের দিকে তাকানোই কঠিন—কটাক্ষ সে তো আরো দুঃসহ। দৃষ্টির মিলন হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমার ধৈর্যের শাখা ছেদন করেছে। তার মেঘের ন্যায় মেদুর অঙ্গকান্তি আর পীত বসন, তার মৃদু মৃদু আলাপন আমার মনে বাসনার অগ্নিশিখাকে প্রজ্বলিত করল। তার ধূমে আচ্ছন্ন হল প্রচলিত ধর্মের পথ। সে পথের নিশানা জেনেও কুলবতী নারী তা থেকে দূরেই থেকে যায়। সে যখন বাঁশিতে তুলেছে তান তখন তার ফুৎকারে সেই অগ্নিশিখা দ্বিগুণ জ্বলে উঠে লাজ গৌরব সবই পুড়িয়ে ফেলল।

৭

কি পেখলুঁ বরজ- রাজকুলনন্দন
রূপে হরল পরান।
নিরমিয়া রসনিধি আমারে না দিল বিধি
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান॥
একে সে চিকন তনু কাঞ্চন আভরণ
কিরণহিঁ ভুবন উজোর।
দরশনে লোচন লোরে অগোরল
না চিহ্নলু কাল কি গোর॥
সহজে দৃগঞ্চল অরুণ কঞ্জ-দল
তাহে কত ফুল-শর সাজে।
দিঠি মোর পরশিতে ও হাসি অলখিতে
শেল রহল হৃদি-মাঝে॥
সরস কপোল লোল মণি কুণ্ডল
ঝাঁপল দিনকর-ভাস।
ও রূপ-লাবণি দিঠি ভরি না পেখলুঁ
তুখিয়া অনন্তদাস॥

ধীরে ধীরে রূপাবিষ্ট মন ডুব দিতে চলেছে প্রেমের অতলে, বেদনার গভীরে। চোখের দেখা ঘটেছে ক্ষণকালের জন্য। কিন্তু মনের বীণায় চিরকালের ঝংকার ধ্বনিত হয়েছে। দেখতে দেখতে চোখের জলে চোখ ভেসে গেছে। রাধা বলছেন, আমি লক্ষ্য করিনি সে কৃষ্ণাঙ্গ কি গৌরাঙ্গ। সে সমস্ত সূর্যালোককে নিষ্প্রভ করে নিজের রূপলাবণ্যের দ্যুতি নিয়ে চলে গেল। রইল শুধু বেদনা। এই বেদনা বুকে রাধা সংসারের মাঝে হলেন নির্বাসিতা। প্রেম দিল তাঁকে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥
রাই এমন কেনে বা হৈল
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল ॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পড়ে ॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা ॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাঢ়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে ॥

- - - - -

এক লহমায় যেন ভেসে গেছে সকল সামাজিক প্রথার বন্ধন। ঘরের গুরুজনবৃন্দকে লঘু মনে হয়। গৃহচারিণী নারী গৃহগত সীমাকে যেন ভুলতে পারলে বাঁচেন। যে বাঁশির সুরে ভেঙে গেছে সকল কুল-মর্যাদার কপাট, এখন শুধু সেই বাঁশির সন্ধানে কদম্বকাননের দিকে চাওয়া। পরবর্তী পদে বলা হচ্ছে রাধা স্থির, রাধা আত্মগত ভাবনায় লীন, এ-পদে বলা হচ্ছে রাধা চঞ্চল, রাধা অস্থির। প্রেমের প্রথম উন্মেষের মানসিকতায় দুই সত্য। কেবল দুই

পদে এক জায়গায় মিল। রাধা স্বজন-সঙ্গিনী পরিহার করে নির্জনতায় যেতে চান। পরবর্তী পদে সেই নির্জনচারিণী প্রেমতপস্বিনীর মূর্তিটি অনুপম।

অন্ধকারে আর রেখো না ভয়,
আমার হাতে রেখো তোমার মুখ,
দু-চোখে দিয়ে দাও দুঃখ-সুখ
দু-বাহু ঘিরে গড়ো তোমার জয়,
আমার তালে গাঁথো তোমার লয়।

(বিষ্ণু দে)

৯

রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা

বসিয়া বিরলে　　　　　থাকয়ে একলে
　　না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে　　　　　চাহে মেঘপানে
　　না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে　　　　　রাঙ্গা বাস পরে
　　যেমত যোগিনী পারা ॥
আউলাইয়া বেণী　　　　ফুলের গাঁথনি
　　দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বদনে　　　　　চাহে মেঘপানে
　　কি কহে দু-হাত তুলি ॥
একদিঠ করি　　　　　ময়ূর-ময়ূরী
　　কণ্ঠ করে নিরখনে।
চণ্ডীদাসে কয়　　　　　নব পরিচয়
　　কালিয়া বন্ধুর সনে ॥

এ নব পরিচয়ের প্রথম প্লাবনে সংসার-বিস্মৃতি ঘটেছে নায়িকার। কখনো মেঘে, কখনো ময়ূরে, কখনো বা নিজেরই শিথিল কেশরাশিতে তিনি সন্ধান করেন কাকে? কেন তিনি অকস্মাৎ নির্জনচারিণী? কেন উপেক্ষা সখীদলের সকল সম্ভাষণকে? বিশীর্ণা ও রুক্ষকেশিনীর রাঙা কাপড়ে কি বৈরাগ্যের অনুরঞ্জন—নাকি এ-বৈরাগ্য অনুরাগেরই উল্টোপিঠ? চণ্ডীদাস এক কথায় সকল প্রশ্নের নিরসন ঘটালেন—নব পরিচয় কালিয়া বন্ধুর সনে।

কিন্তু এ-বিহ্বলতা দ্রুত রূপান্তরিত হল যন্ত্রণায়। কেননা প্রেম মানেই যে যন্ত্রণা আর এ-কথা তো বৈষ্ণব পদকারদের মতো কেউ জানেন না। রাধার পূর্বরাগের প্রথম স্বর্ণমদিরা দেখতে দেখতে বহন করে আনল তীব্র জ্বালা।

১০

একে কুলবতী ধনি তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লুটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছলছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস বলে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া॥

নবোন্মেষিত প্রেমের যন্ত্রণা অসহ্য। ব্যাধির মতো অবর্ণনীয়। যে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে তারই চরণ ধরে রাধার কান্না শুরু হয়। সুবর্ণ পুত্তলী যেন অনাদরে ধূলায় লুটিয়ে রয়েছে—শিথিল কবরীর আকুল কেশরাশি ধূলায় ধূসর। কোথায় দেখেছ তাকে—এই কথাই জিজ্ঞাসা করেন সবাইকে।

১১

হেন রূপ কবহুঁ না দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই   সেই অঙ্গ হৈতে মুঞি
ফিরাইয়া লইতে নারি আঁখি ॥
অঙ্গে নানা আভরণ   কালিন্দী-তরঙ্গে যেন
চাঁদ চলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে   ডুবিলাম রসের কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী ॥
বিনা-মেঘে ঘন-আভা   পীত বসন শোভা
অল্প উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া   দো-স্নুতী মুকুতা বেড়া
মত্ত ময়ূর-পুচ্ছ তায় ॥
গলায় কদম্ব-মালা   জিনিয়া মদন-কলা
অধরে মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী পূরে   অবলা পরানে মরে
বলিহারি যায় বংশীদাস ॥

কৃষ্ণ-রূপের সায়রে রাধার অসহায় অবস্থা উপভোগ্য। শ্রীকৃষ্ণের শরীরের যে অংশে দৃষ্টি পড়ে সেখান থেকেই আর চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তাঁর অঙ্গের সোনার অলংকার যেন কালিন্দীর হিল্লোলে প্রতিফলিত চন্দ্রকররাশি। রাধা বলছেন—আমি সেই রসের কূপের মধ্যে নিপতিত অসহায় নারী। তার প্রতি অঙ্গে যেন সহস্র চন্দ্রের শোভা। তাঁর মোহন-চূড়া, পীত বসন, আর গলার কদম্বমালার কথা ভাবতে ভাবতেই যেন রাধা বলেন :

১২

আলো মুঞি জানো না—জানিলে যাইতাম না
কদম্বের তলে।
চিত্ত হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে পিয়া কি জানি করে প্রাণ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদে ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুত্তলী রৈল বান্ধা॥
কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোঁড়া॥
জাতি কুল গেল মোর হেন বুদ্ধি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হইয়া দু-কুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দৃঢ় করি থাক বুক॥

প্রেমের প্রথম প্রাবল্য বর্ণনা হিসাবে পদটি অতুলনীয়। নায়ক যে শুধু চিত্ত হরণ করেছে তাই নয়, আঁখি ডুবে গেছে রূপের পাথারে—সে দিশাহারা। মন হারিয়ে গেছে যৌবনের বনে—সে উদ্‌ভ্রান্ত। ঘরের বাইরে শতবার করে যে যায়, সে যায় কিসের আশায়? সে আশা যখন অপূর্ণ থাকে তখন সে ঘরে ফেরে কেমন করে? জ্ঞানদাস বলছেন যে রাধার প্রত্যাবর্তনের পথের যেন শেষ হয় না। মন্থর চরণে উদ্‌ভ্রান্ত মনের ভার বইতে গিয়ে রাধা যেন অন্তবিহীন পথের পথিক। শুধু কবি সান্ত্বনা দেন—হে নায়িকা তুমি দৃঢ় হও।

১৩

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি ॥
ধনি অলপ বয়েস বালা
জনু গাঁথনি পুহপ মালা।
থোরি দরশনে আশ ন পূরল
বাঢ়ল মদন-জ্বালা ॥
গোরি কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজোর সোনা।
কেশরী জিনিয়া মাঝহিঁ খীন
দুলহ লোচন-কোনা ॥
ইসত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভনে।

উভয়ের পরিচয়-বিহীন সাক্ষাতেরও অথচ ওদিকে অন্ত নেই। সন্ধ্যা লগ্নে গৌরাঙ্গী তরুণীর সুগ্রথিত পুষ্পমাল্যের মতো শরীর নায়ককে বারেক চমকিত করে মিলিয়ে গেল। যেন মেঘের উপরে ক্ষণেকের জন্য লীলা করে গেল বিদ্যুৎরেখা। কিন্তু ক্ষণ-দর্শনে তো তৃপ্তি নেই। সেই ক্ষীণাঙ্গী তরুণীর উজ্জ্বল স্বর্ণরেখার ন্যায় দীপ্তি এবং দুর্লভ কটাক্ষের আঘাতে বিচলিত-চিত্ত নায়কের আকুলতা আরো বৃদ্ধি পেল। ভালো করে দেখা হল না এই আক্ষেপে সে বিভোর। এমনই অন্য কোনো এক ক্ষণ-সাক্ষাতের পর কৃষ্ণের অনুযোগ ধ্বনিত হল এই ভাবে :

১৪

সজনি ভালো করি পেখন না ভেল।

মেঘমাল সঞে তড়িত-লতা জনু

হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥

আধ আঁচর খসি আধ বদনে হসি

আধহিঁ নয়ন-তরঙ্গ।

আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি

তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥

একে তনু গোরা কনক কটোরা

অতনু কাঁচলা উপাম।

হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন

ফাঁস পসারল কাম ॥

দশন মুকুতা-পাঁতি অধরে মিলায়ত

মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাষা।

বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ

হেরি হেরি ন পূরল আশা ॥

একই আকুতি এখানেও নায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত—হেরি হেরি ন পূরল আশা। দেখে দেখে সাধ মেটে না। রাধার বক্ষদেশে বিলম্বিত কণ্ঠহার যে ফাঁস-বন্ধ করেছে কৃষ্ণের সমস্ত মনকে। মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাষা—সেই অস্ফুট অর্ধোচ্চারিত বাণী যেন অপরিচয়ের দূরত্বকে আরো দুস্তর করে তুলেছে। আর সেই দুস্তর দূরত্বের বোধকে ধীরে ধীরে গাঢ় করে তুলেছে আধ-বদন, আধ-উরজ প্রভৃতি বর্ণনায় আধ শব্দের আধিক্য।

১৫

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ॥

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো

বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো

কেমনে পাইব সই তারে॥

নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো

অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো

যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো

কি করিব কি হবে উপায়।

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে

আপনার যৌবন যাচায়॥

রাধাও নির্জনে ভাবেন—কে সে? কে বাঁশি বাজায় যমুনার কুলে? কেউ এক সখী বলেছে শ্যাম নাম। নাম জানার সঙ্গে সঙ্গে অপরিচয়ের যবনিকা তুলতে শুরু করল। সমস্ত হৃদয়কে ব্যাকুল করে রাধার গৃহধর্মে এল বিপর্যয়। যতক্ষণ প্রেম নেই ততক্ষণ তো জীবনের প্রচলিত ছকে নেই সংঘাত। প্রেমের প্রথম তরঙ্গেই সেই সংঘাতের আরম্ভ। নাম তখন আর নাম মাত্র নয়। বিপুল আবেগময় সম্ভাবনার তীব্র সূচনা। পরের পদটিতে তারি ইঙ্গিত।

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো

জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।

দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী

মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।

(অমিয় চক্রবর্তী)

১৬

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন-আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরান রয়॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
কহিলুঁ সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর
সদাই হিয়ায় জাগে॥

এখানে তাই সবই শ্যামময় দেখি—এটাই প্রধান কথা। সুধা আর বিস, নিম আর মধু একত্র করে কানুপ্রেম। কাজেই ছলছল আঁখির অশ্রুধারায় বেদনাও যত পুলকও তত। যমুনার ঝলমল জলরাশিতে প্রতিদিনের জলকে যাওয়ায় যত প্রতীক্ষা তত নৈরাশ্য। "একি শুধু জল নিতে আসা—এই আনাগোনা কিসের লাগি যে কী কব কী আছে ভাষা।" হৃদয়ে শুরু হল তার নিত্য আরতি।

১৭

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মুরুছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খনে দেখিনু
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেনবা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান-কটাখে বিষম-বিশিখে
পরান বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন- ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়াব মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি সরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরান
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥

এমনই সেই সুন্দরের অঙ্গকান্তি, যে রাধা মনে করেন সারা বিশ্ব বুঝি

প্লাবিত হয়ে যাবে সেই লাবণ্যধারায়। সকল ধৈর্যের যেন অবসান হয়, সকল চিত্ত যেন আকুল হয়ে ওঠে ক্রন্দনের আবেগে। কৃষ্ণের বক্ষদেশে বিলম্বিত মালতী ফুলের মালার কথাটি লক্ষণীয়। উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে—প্রমত্ত ভ্রমরা যেন রাধার হৃদয়েরই প্রতীক। সেও যেন রাধার হৃদয়েরই মতো প্রেমকুসুমের সুরভিত আহ্বানে আত্মহারা। রাধার আক্ষেপে চিরকালের নারী হৃদয়ের প্রতিধ্বনি—এমন কঠিন নারীর পরান বাহির নাহিক হয়।

১৮

বেলি অবসান-কালে একা গিয়েছিলাম জলে

জলের ভিতরে শ্যাম রায়।

ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে

পুন কানু জলেতে লুকায় ॥

যমুনাতে ঢেউ দিতে বিম্ব উঠে আচম্বিতে

বিম্বের মাঝারে শ্যাম রায়।

চূড়ার টালনি বামে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠামে

হেরিয়া সে কুল রাখা দায় ॥

পুন জলে দিতে ঢেউ কোথাও না দেখি কেউ

জল স্থির হৈলে দেখি কানু।

ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পারি

অনুরাগে জলে ডুবেছিনু ॥

কর বাড়াইয়া যাই শ্যামের নাগাল নাহি পাই

কান্দিতে কান্দিতে আইলাম ঘরে।

হায় আমি অভাগিনী না পাইলাম শ্যাম গুণমণি

সেই দুখে হৃদয় বিদরে ॥

বসু রামানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনী

অকারণে জলে ডুবেছিলে।

বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গ-ছায়া

শ্যাম ছিল কদম্বের মূলে ॥

একাকিনী রাধা বেলাশেষের ম্লান আলোয় যমুনার তীরে গিয়েছিলেন। কানু ছিলেন যমুনার কূলে কদম্বের মূলে। জলে পড়েছিল তাঁর ছায়া। হয়তো রাধা ভেবেছিলেন কানুর কথা ভেবে ভেবে সর্বত্র কানুময় দেখছেন তিনি। ভেবেছিলেন এ-হয়তো মায়া। তাই ভেবে জলে ঢেউ দিতে জেগে উঠল বুদ্বুদের রাশি। শ্যামচ্ছবি সে বুদ্বুদেও অম্লান। কখনো ঢেউ দিতে তাঁকে

দেখা যায়—কথনো তিনি মিলিয়ে যান। আবার জল স্থির হলে ছায়ায় তিনি ফিরে আসেন। জল যেন মনেরই প্রতীক। রাধা জোর করে মন থেকে শ্যামের ছায়া মুছে দিতে চান। মনের অস্থিরতার শত বিভঙ্গে কথনো শ্যামের স্মৃতি দ্বিগুণ, কথনও স্থির মনের ধ্যানলোকে তিনি উজ্জ্বলতর। অনুরাগে জলে ডুবেছিনু—বাস্তবেও যত সত্য, রূপকেও তত সত্য। প্রেমের পাত্রকে ঘুরে ফিরে নিজের মনেই সন্ধান করতে হয়।

কিন্তু সে সন্ধানেও তো শান্তি নেই। ঘর আর বাহিরের দ্বন্দ্বের অবসান কোথায়। তাই ঘর ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণাও তো কম নয়।

১৯

সই, কেনে গেলাম যমুনার জলে।

নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ

ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে॥

দিয়া হাস্য-সুধা চার অঙ্গছটা আঠা তার

আঁখি-পাখি তাহাতে পড়িল।

মন-মৃগী সেইকালে পড়িল রূপের জালে

বাঁশি-ফাঁসি গলায় লাগিল॥

ধৈর্য-শীল-হেমাগার গুরু-গৌরব-সিংহদ্বার

ধরম-কপাট ছিল তায়।

বংশীরব-বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে

সমভূমি করিল আমায়॥

(আমার) চিত্তশালে মত্ত হাতি বাঁধা ছিল দিবারাতি

ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।

দন্তের শিকল কাটি চারিদিকে যায় ছুটি

না পাইলাম তাহার উদ্দেশে॥

কালিয়া কুটিল বানে কুল-শীল কোনখানে

ডুবিল, উঠিল ব্রজের বাস।

প্রাণমাত্র আছে বাকি তাও বুঝি যায় সখী

ভনয়ে জগদানন্দ দাস॥

তাই, নবোচ্ছ্বসিত বন্যা-প্রতিম প্রেম কেমন করে এতদিনের অভ্যস্ত জীবনাচরণকে ধ্বংস করে দিল রাধা যেন তারই বর্ণনা করছেন এই পদে। পাখির ফাঁদে পড়া এবং হরিণীর জালে পড়ার সঙ্গে তার তুলনা। গৌরবে সমৃদ্ধ প্রাসাদের দাম্ভিক চূড়ায় বজ্রাঘাতের নিষ্ঠুর আকস্মিকতায় তার উপমা। সবচেয়ে চমৎকার কথা হল এখানে—চিত্তের সমস্ত দম্ভ মদ-মোহের বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করে কৃষ্ণকটাক্ষ-অঙ্কুশের ঘায়ে স্বেচ্ছাচারী বাসনা মত্ত হস্তীর মতো ছুটে চলে গেছে।

২০
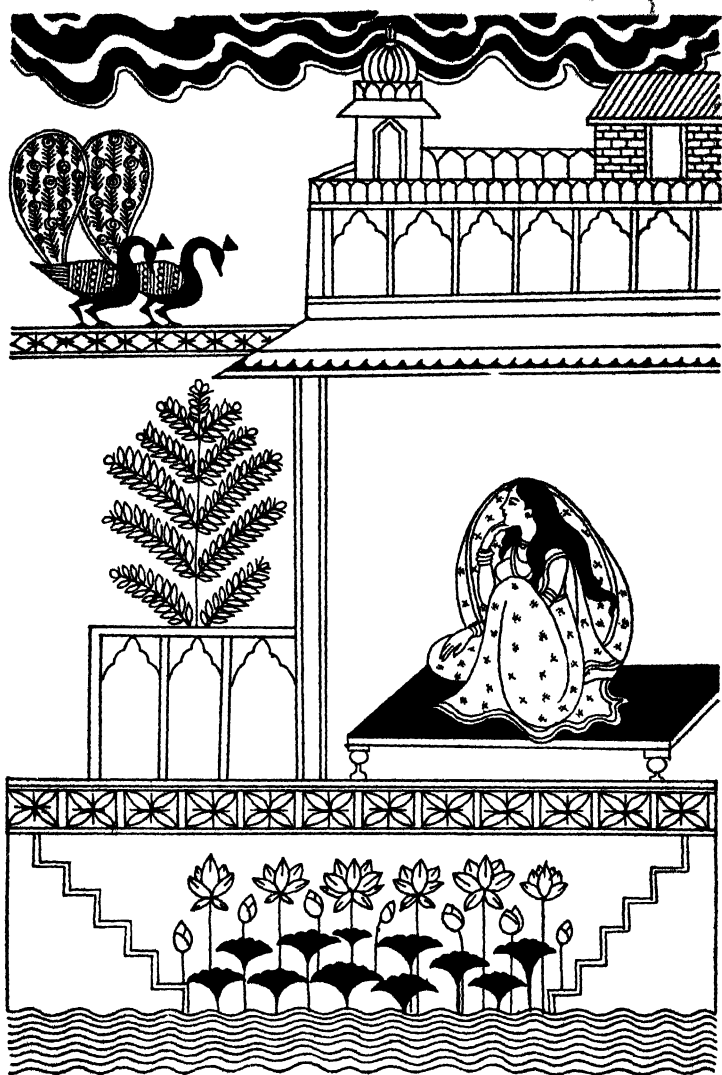
সহচরী মেলি   চললি বররঙ্গিনী
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরিষ   কুসুম জনু তনু-রুচি
দিনকর-কিরণে মৈলান॥
সজনি, সো ধনি চিতক চোর।
চোরিক পন্থ   ভোরি দরশায়লি
চঞ্চল নয়নক ওর॥
কোমল চরণ   চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি   সজল দিঠি-পঙ্কজ
তুহুঁ পাদুক করি নেল॥
চিত-নয়ন মঝু   তুহুঁ সে চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ পাপ   দহনে তনু জারত
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

- - - - -

ওদিকে অদর্শনের বেদনা তো কৃষ্ণেরও অল্প নয়। তিনি অপেক্ষা করে থাকেন কালিন্দীর পথে। সহচরী পরিবৃতা রাধা চলেছেন স্নানে। অপরূপ তনুরুচি খরসূর্যকিরণে মলিন। রাধার ক্লেশে কৃষ্ণ দুঃখ মানেন। রাধা বিহ্বল কটাক্ষে কৃষ্ণের হৃদয়কে চুরি করেছেন। কাজেই কৃষ্ণ অনুসরণ করেছেন রাধাকে। উত্তপ্ত বালুকাময় পথে রাধার কোমল চরণ পীড়িত। দেখতে দেখতে সমবেদনায় কৃষ্ণের আঁখি ভরে উঠল অশ্রুতে। কৃষ্ণের সজল নয়ন-কমল পুষ্পাঞ্জলির মতো লগ্ন হয়ে রইল রাধার চরণে। রাধা এমন ভাবেই অধিকার করেছেন তাঁর মনকে যে কৃষ্ণ-আঁখি পাদুকার মতো রাধার চরণস্থ হল। চোখ গেল। মনও গেল। এখন এই শূন্য হৃদয়ের কী গতি?

২১

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাহাঁ যাহাঁ অরুণ-চরণ চল চলই।
তাহাঁ তাহাঁ থল-কমল-দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাহাঁ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাহাঁ তাহাঁ উছলই কালিন্দী-হিলোল॥
যাহাঁ যাহাঁ তরল বিলোচন পড়ই।
তাহাঁ তাহাঁ নীল উৎপল বন ভরই॥
যাহাঁ যাহাঁ হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাহাঁ তাহাঁ কুন্দ-কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান॥

কৃষ্ণ দেখেন কলহাস্যময়ী সখী-সঙ্গিনীদের সাথে লীলাচঞ্চল রাধা পথ দিয়ে চলে যান। তিনি ভাবেন, রাধার বসনান্তরাল থেকে যেখানে যেখানে অঙ্গ-কান্তির প্রকাশ ঘটছে সেখানেই যেন মেঘের আড়াল থেকে বিদ্যুতের চমক নয়ন ধাঁধিয়ে দেয়। স্মরণীয়, রাধা নীল শাড়ি পরতেন, যা নীল মেঘের সঙ্গেই তুলনীয়। পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে অলক্তরঞ্জিত রাক্তম চরণ যুগলকে, মনে হচ্ছে যেন বৃন্ত থেকে খসে পড়ছে স্থলপদ্মের দল। কৃষ্ণ ভাবেন—কে এই তরুণী? এ-যেন সখীদের সঙ্গে খেলা করার ছল করে আমারই জীবন নিয়ে খেলা করছে। এরই বঙ্কিম ভ্রূ-বিভঙ্গে যমুনার তরঙ্গ-ভঙ্গ, এরই নীল নয়নের দৃষ্টিপাতে নীল ফুল ফুটে ওঠে বনভূমিতে—এরই হাসিতে কুন্দকুমুদের প্রকাশ। কবি বলছেন যে, তুমি ঠিকই চিনেছ এ কে, শুধু মুগ্ধ হয়েছ বলে চিনেও চিনতে পারছ না।

২২

নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখি
সমুখে হেরল বর-কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি নত-মুখি
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখি হে অপরূপ চাতুরি গোরি।
সব জন তেজি আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তহিঁ ফেরি॥
তহিঁ পুন মোতিহার টুটি পেলল
কহত হাব টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি কেল॥
নয়ন-চকোর কানু-মুখ শশি-বর
কয়ল অমিয়া রস পান।
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান॥

এমনই দেখাশোনা মাঝে মাঝে। কৃষ্ণের দুই চোখে তখন রাধারূপের মায়া, মনে তার নিত্য আহ্বান। একদা স্নানান্তে তীরে উঠে রাধা চেয়ে দেখলেন দর্শন-প্রত্যাশী সুন্দর কানুকে। সঙ্গে রয়েছেন গুরুজনেরা। লজ্জায় অবনতমুখী ভাবেন কেমন করে কৃষ্ণের মুখখানিকে দেখবেন। প্রেমই জোগাল বুদ্ধি। চাতুর্যের সঙ্গে পরিজনদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন রাধা। তারপর পিছু ফিরে তাদের ডাকার ছল করে রাধা কৃষ্ণমুখ দর্শন করলেন। তাতেও আশা মিটল না। তখন গলার মুক্তার মালা ছিঁড়ে ফেললেন মাটিতে। অন্য পরিজনেরা একটা একটা মুক্তা পথ থেকে কুড়িয়ে তুলতে লাগল। সেই অবসরে রাধা কৃষ্ণমুখ দর্শন করলেন। দুজনেই বুঝলেন ভালবাসার প্রসারকে।
এদিন কৃষ্ণ কোনো কথা বলেননি।

২৩

অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ

বারল লোচন-চোর।

পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল

জনি সে চাঁদ চকোর॥

ততহুঁ সঞে হঠে হটি মোঞে আনল

ধএল চরণ রাখি।

মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ

তইঅও পসারএ পাঁখি॥

মাধব বোলল মধুর বাণী

সে শুনি মূহু মোঞে কান।

তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল

ধরি ধনু পাঁচ বাণ॥

তনু-পসেবে পসাহনি ভাসলি

পুলক তৈসন জাগু।

চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি

বাহু-বলয়া ভাগু॥

ভন বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো

বোলল বোল ন যায়।

রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ

শ্যামসুন্দর কায়॥

- - - - -

কিন্তু এই রকম চৌরদর্শনের বেলায় কৃষ্ণ একদিন কথা বললেন, করলেন প্রথম প্রিয়-সম্ভাষণ। সেদিন রাধা কেমন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় পড়েছিলেন এখানে তাই বর্ণিত হচ্ছে। রাধা অবনত মুখে চোখ দুটিকে নিষেধ করে বেঁধে রাখতে চাইলেন, তারা চন্দ্রকরলুব্ধ চকোরের মতো ছুটে যেতে চাইল। জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে নিজ চরণে নিবদ্ধ করতে চাইলেন। চোখের

অবস্থা হল মধুপান-প্রমত্ত মধুকরের মতো। তারও তখন উড়ে যাবার শক্তি নেই —কিন্তু পাখা মেলে দিতে সে তখনও ছাড়ে না। এদিন কৃষ্ণ কোনো কথা বলে থাকবেন। কানে হাত দিয়ে সেই বাণীকে রোধ করতে চেয়েছেন রাধা, আর সঙ্গে সঙ্গে অতনু শরাঘাতে তিনি হলেন বিপর্যস্ত। তিনি হয়ে উঠলেন স্বেদাঞ্চিত। প্রসাধন অঙ্গরাগ হৃদয়েরই মতো ভেসে গেল। চুনচুন শব্দে কাঁচুলি ছিঁড়ে গেল—হয়তো তাঁরও শকুন্তলার মতো বসন-বাকলকে আঁট মনে হয়েছিল। বলয় গেল ভেঙে। তাঁর তখন হাত কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। উত্তর দেবেন কি, কথা রুদ্ধ হয়েছে আবেগে—"হৃদয়ের একূল ওকূল দু-কূল ভেসে যায়, হায় সজনী।"

২৪

শুনইতে কানহি আনহি শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদগদ উত্তর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান॥
সখি হে কী ভেল এ বরনারী।
করহুঁ কপোল থকিত রহু ঝামরি
জনু ধন-হারি জুয়াড়ী॥
বিছুরল হাস রভস রস-চাতুরি
বাউরি জনু ভেল গোরি।
খনে খনে দীঘ নিশসি তনু মোড়ই
সঘন ভরমে ভেলি ভোরি॥
কাতর কাতর নয়নে নেহারই
কাতর কাতর কহ বাণী।
না জানিয়ে কোন্ দুখে নিদারুণ বেদন
ঝর ঝর এ দুই নয়ানি॥
ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহিঁ কাঁপ।
বলরাম দাস কহ জানলু জগ মাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ॥

উন্মনা রাধা এক শুনতে আর শুনছেন। এক বুঝতে আর বুঝছেন। কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু সজল নয়নে চেয়ে থাকেন—নিরুত্তর। জুয়াখেলায় সর্বহারা মানুষের মতো তিনি মলিন মুখে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। হাসি ভুলে গেছেন। কখনও অশ্রুতে, কখনও দীর্ঘশ্বাসে, কখনও কাতরোক্তিতে এই প্রেমের সন্তাপকে ব্যক্ত করছেন।

২৫

কাঞ্চন কমল   পবনে উলটায়ল

ঐছন বদন সঞ্চারি।

সরবস লেই   পালটি পুন বিঙ্কলি

রঙ্গিণি বঙ্ক নেহারি॥

সজনি কো দেই দারুণ বাধা।

নয়নক সাধ   আধ নাহি পূরল,

পালটি না হেরলুঁ রাধা॥

ঘন-ঘন আঁচর   কুচগিরি কাঁচর

হাসি হাসি তহি পুন হেরি।

জনু মঝু মন হরি   কনয়া-কুম্ভ ভরি

মুহরি রাখলি কত বেরি॥

যব মন বান্ধল   ইন্দ্রিয় ফাঁকর

তহি মিলল আন আন।

কাঠক পুতলি   ঐছে মুরুছায়ত

গোবিন্দদাস পরমাণ॥

সোনার কমল যেমন হঠাৎ হাওয়ায় ঘুরে যায় তেমনই অকস্মাৎ রাধা ফিরে তাকিয়েছিলেন কৃষ্ণের দিকে। অপরিচয়ের লজ্জা তখন কিছুটা দূরীভূত। হেসে, সচকিতে নিজের বুকের দিকে বারেক তাকিয়ে রাধা চলে গেলেন। অতৃপ্ত-দর্শন কৃষ্ণের মনে হল যেন তাঁর সমস্ত মনকে রাধা বক্ষের কনক-কলসের মধ্যে বন্দী করে সেই কলসকে মোহরাঙ্কিত করে দিলেন। তা বুঝি আর কখনও ফেরত পাওয়া যাবে না। কৃষ্ণ বলছেন—সেই রূপের আভায় কাঠের পুতুলও মূর্ছিত হয়ে পড়ে। গোবিন্দদাস সাক্ষ্য দিয়ে বলছেন—হ্যাঁ, তার প্রমাণ তো তিনি নিজে।

রতন-মঞ্জরী ধনি লাবণি সায়র
অধরহিঁ বান্ধুলি রঙ্গ।
দশন-কাঁতি কত দামিনী ঝলকত
হসইতে অমিয়া-তরঙ্গ ॥
সজনি, যাইতে পেখলুঁ রাই।
মুখে হেরি সুন্দরি মরমহি চঞ্চল
চকিত চমকি চলি যাই ॥
পদ তুই চারি চলই বর নায়রী
রহলি নিমিখ শর জোরি।
বিষম বিশিখ শর অন্তর জরজর
সরবস লেয়লি মোরি ॥
মঝু মন যশ গুণ সুধি মতি ধাধস
লেই চললি সব বালা।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
জপতহিঁ তুয়া গুণ-মালা ॥

- - - - -

রাধা এইভাবে সরমে অরুণ-রঞ্জিত মুখে চমকিত চিত্তে ফিরে গেলেন। কৃষ্ণ ভাবেন—এ এক আশ্চর্য লাবণ্য-সায়র। এর অধরে বাঁধুলি ফুলের রঙ। এর হাসিতে অমিয়-তরঙ্গ। চকিতে চমকিত তরুণী চলে গেল। হয়তো বারেক থেমেছিল—কী ভেবে ফিরালে মুখখানি। কৃষ্ণ বলছেন—সে চলে গেল, নিয়ে গেল আমার সর্বস্ব। আমার মন। আমার যশ-গুণ। আমার চৈতন্য। আমার বুদ্ধি। আমার দৃঢ়তা। এখন এই আমার জপমালা।

২৭

সখি কাহে কহ বিপরীত।
হাম নহ চপল-চরিত ॥
জগতে বিদিত মঝু নাম।
মদন পরাজয়ী শ্যাম ॥
কৈছন রাধা নাম।
কভু নাহি শুনি গুণগাম ॥
পরনারী নয়নে না হেরি।
ঐছন না বোলহ ফেরি ॥
না করহ ও পরসঙ্গ।
শুনইতে দগধয়ে অঙ্গ ॥
পুন যদি কহ অনুচিত।
ব্রজ মাহা করব বিদিত ॥
এত কহি পদ দুই যাই।
বটু পরবোধল তাই ॥
যদুনন্দন দাসক দাস।
শুনইতে ভেল নৈরাশ ॥

রাধার সহচরী এসেছেন কৃষ্ণের কাছে। জানিয়েছেন রাধার মনোবেদনার কথা। তরুণ নায়কের মাথায় কী দুর্মতি ভর করল কে জানে তিনি পরুষ বাক্যে ফিরিয়ে দিলেন রাধার সখীকে। বললেন—সখি, এ সব কথা তোমার আমাকে বলা উচিত নয়। আমি চপল-চরিত্র ব্যক্তি নই। আর কে বা রাধা, তার নাম কিংবা গুণগ্রাম কিছুই আমার জানা নেই। ও প্রসঙ্গ তুমি আমার কাছে উত্থাপন কোরো না। গা জ্বলে যায় এ-সব অনুচিত কথা শুনলে। তুমি যদি পুনরায় এ-সব কথা বলো তাহলে ব্রজবাসী সমাজে এ-কথা আমি রাষ্ট্র করে দেব। শুনে নিরাশ চিত্তে সখী ফিরে গেলেন।

কানুক নিঠুর বচন শুনি সো সখী
আওল রাইক পাশ।
পন্থঘটিত দুখে লোচন ছলছল
কহতহিঁ গদগদ ভাষ॥
সুন্দরি, দূরে কর কানু আশোয়াস
ঐছে নিঠুর সঞে লেহ নহে সমুচিত
না পূরব তুয়া অভিলাষ॥
তোহারি নিদানে হাম কতয়ে শুনায়লুঁ
তাহে যে সুকঠিন বাণী।
সো হাম তুয়া পায় কতয়ে নিবেদব
কহইতে দহয়ে পরানী॥
ঐছন বচন রাই তব দোতি মুখে
শুনইতে মুরছিত ভেল।
ইহ পরমানন্দ দাসক হৃদি মাহা
কো জানি রোপল শেল॥

বিক্ষুব্ধ সখী পথশ্রমে ক্লান্ত দেহে ব্যর্থতায় ছলছল চোখে ফিরে এসে রাধাকে বলছেন—এরকম নিষ্ঠুরের সঙ্গে প্রেম সমুচিত নয়। সখি, তুমি কৃষ্ণের প্রত্যাশা কোরো না। তোমার কথা তাকে বলতে সে যে কঠিন কথা আমাকে শোনাল সে আমি তোমাকে কেমন করে বলব। কৃষ্ণের অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুরতার কথা শুনতে শুনতে রাধা মূর্ছা গেলেন।

শুনিয়া নিঠুর বচন আমার
সে চন্দ্রবদনী রাধা।
হইল প্রেমের অঙ্কুর সুন্দর
ভাঙে পাছে পাঞা বাধা॥
সখি, আর কি কহিব তোরে।
কেনে পরিহাস- বচন নৈরাশ
কহিলুঁ হইয়া ভোরে॥
কিংবা সেই ধনি ধৈর্য ধরে জানি
হৃদয়ে ধরিয়া বেথা।
পাছে সে বেথায়ে সে তনু জারয়ে
উপায় কি করি এথা॥
কিংবা দারুণ কামের কামান
বিন্ধয়ে বিষম শরে।
শিরীষের ফুল জিনিয়া কোমল
সেহ কি সহিতে পারে॥
হা হা সে মুগধি রূপের অবধি
ফলি মনোরথ-লতা।
হা হা কেনে হেন বঞ্চন-বচন
কহি কৈলুঁ উন্মূলিতা॥
অমৃত পুতলি রূপের আগলি
না জানি কি জানি হয়।
এ যদুনন্দন দাস মনে ভন
দর্শনে পরান রয়॥

- - - - -

ওদিকে পরিহাসছলে নিষ্ঠুর বাণী উচ্চারণ করে কৃষ্ণও অনুশোচনায় জর্জরিত। শিরীষ ফুলের মতো কোমল-তনু রাধা যদি এই মনস্তাপে মৃত্যু বরণ করে—এই আশঙ্কায় তখন হঠকারী নায়ক উদ্বেল। এখন কি করা যায়? পদকার পরামর্শ দিচ্ছেন, একবার রাধাকে দেখা দাও, তাহলেই সে প্রাণ ফিরে পাবে।

৩০

ধনি ধনি রমণী-জনম ধনি তোর ;

সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে

সো তুয়া ভাবে বিভোর ॥

চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ

চকোর চাহি রহু চন্দা।

তরু লতিকা অবলম্বন-কারী

মঝু মনে লাগল ধন্দা ॥

কেশ পসারি যবহু তুহুঁ আছলি

উরপর অম্বর আধা।

সো সব হেরি কানু ভেল আকুল

কহ ধনি ইথে কি সমাধা ॥

হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি

করে কর জোরহিঁ মোর।

অলখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি

পুন হেরি সখী কৈলি কোর ॥

এতহুঁ নিদেশ কহল তোহে সুন্দরী

জানি ইহ করহ বিধান।

হৃদয় পুতলি তুহুঁ সো শূন-কলেবর

কবি বিদ্যাপতি ভান ॥

কাজেই কৃষ্ণের রাধাপ্রেমের বার্তা বহন করে কোনো সখী এসে রাধাকে বলল—রাধা তোমার জন্মই ধন্য। কৃষ্ণের জন্য সকলে যেখানে আকুল তখন সে আকুল হয়ে রয়েছে তোমার জন্য। এ-যেন চাতকের জন্য মেঘের পিপাসা, চকোরের জন্য চাঁদের। এ-যেন গাছই চেয়ে বসেছে লতিকার অবলম্বন। কবে সে তোমাকে ঈষৎ অসংবৃত বাসে দেখেছে, দেখেছে তোমার হাসি, তুমি কৃতাঞ্জলি ছিলে কৃষ্ণকে দেখে, কোলে নিয়েছিলে কোন্ সখীকে, এ-সবই তার স্মৃতিতে সজীব। তুমিই তার হৃদয়ের প্রতিমা—তুমি বিনা সে শূন্য মন্দির।

৩১

কত যে কলাবতী যুবতী সুমূরতি
নিবসতি গোকুল মাহ।
হরি অব হাসি রভসে পুন কানুকে
কুটিল নয়নে নাহি চাহ॥
সুন্দরি, অতয়ে করিয়ে অনুমান।
শুভখনে স্বামী- বরত তুহুঁ ছোড়লি
নারী-বরত নিল কান॥
তুয়া নিজ নাম গাম ঘন গাবই
সো এক আখর রঙ্ক।
শুনইতে রাতি রতন রতি রাতুল
চমকই তোহারি আতঙ্ক॥
তুয়া গুণগাম নাম কত গাবই
আবেকত মুরলী নিশান।
সহচরী কোরে ভোরি তোহে ডাকই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

সখীরা ফিরে এসে রাধাকে বলছেন—তুমি ধন্য। গোকুলে কত গুণবতী নারী আছে। কৃষ্ণ তোমাকে দেখার পর থেকে কারো দিকে কটাক্ষেও তাকান না। তুমি স্বামীব্রত ছাড়লে কৃষ্ণ নিল নারীব্রত অর্থাৎ রাধা-ব্রত। সে বাঁশিতে শুধু তোমার নামধাম আর গুণগ্রাম গান করে। রাতি, রতন, রতি, রাতুল প্রভৃতি শব্দ শুনলেই কৃষ্ণ আর্ত হয়ে ওঠেন। কেননা সমস্ত শব্দগুলিরই প্রথম অক্ষর 'র'—রাধা নামের আদ্যক্ষর। কৃষ্ণের তৃষিত কর্ণ এখন তোমার নামের এক অক্ষরের ভিখারী। সে তোমারই সহচরীর কাছে তোমার নাম গান করতে করতে সংবিৎহারা।

৩২

এই মনে বনে দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজবালা সনে
কিসের রভস রঙ্গ॥
এমন আঁচর নাহি করো ডর
ঘনাঞা আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে করিব গোচর
তখন জানিবা পাছে॥
ছুঁইয়ো না ছুঁইয়ো না নিলজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পরপুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি॥
গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ
পান কনক ধূমে।
কাম সাগরে কামনা করহ
বেণী বদরিকাশ্রমে॥
সূর্য উপরাগে সহস্র সুন্দরী
ব্রাহ্মণে করহ সাত।
তবু হয়ে নহে তোমার শকতি
রাই অঙ্গে দিতে হাত॥
গোবিন্দদাসের বচন মানহ
না করো এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরী ও রসে আগরি
করহ তাকর সঙ্গ॥

কল্পনা করা যেতে পারে এমনই সংবিৎহারা কৃষ্ণ একদিন নিঃসঙ্গ অরণ্যপথ-

চারিণী রাধার হাত ধরতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন মহাদান। কৃত্রিম কোপে রাধাও বলেছিলেন—আমায় স্পর্শ কোরো না। আমি দুর্লভ নারীরত্ন। এত দুর্লভ যে কনকধূমপানের মতো কঠিন তপস্যাতেও আমাকে মেলে না। তুমি প্রয়াগে বা কোনো তীর্থে যাও। কিংবা পাহাড়ে যাও। সেখানে গৌরী আরাধনা করো। সূর্যগ্রহণে নানা তপশ্চর্যা করো। সুন্দরী মিলতে পারে। কিন্তু রাই অঙ্গের লোভ কোরো না।

তোহারি হৃদয় বেণী বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচগিরি কোর।
সুন্দর বদন-ছবি কনক-ধূম পিবি
ততহিঁ তপত জিউ মোর॥
সুন্দরি তোহারি চরণযুগ ছোড়ি।
গৌরী আরাধনে কাহাঁ চলি যাওব
তুহুঁ সে তিরথময়ী গোরী॥
সিন্দুর সুন্দর মৃগমদ পরশল
এহি সূরজ-গ্রহ জানি।
তুয়া পদ-নখ দ্বিজ রাজহি সোঁপলুঁ
সুন্দরী সহস্র পরানী॥
কামসাগরে হাম সহজই নিমগন
কাম পূরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বলি অব চরণে না ঠেলবি
গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

- - - - -

বাক্যবিন্যাসে বিদগ্ধ নায়কও কিছু কম পটু নন। তিনি রাধার পরামর্শের জবাবে বললেন—কোথায় পাব প্রয়াগ, তোমার হৃদয়ই তো আমার প্রয়াগ তীর্থ। কী দরকার গিরিচূড়ায়—তোমার বক্ষের যুগল গিরিচূড়া ছেড়ে? গৌরী আরাধনার কথা কী বলছ সুন্দরী—তুমিই আমার তীর্থসর্বস্বসার গৌরী। তোমার মুখচ্ছবিই আমার যথেষ্ট হৃদয়তাপের কারণ—কনকধূমপান নিষ্প্রয়োজন। কিসের সূর্যগ্রহণে যেতে বলছ আমায়, তোমার সুন্দর সিঁদুরের টিপের উপর মৃগমদ স্পর্শের চেয়েও কি তা মনোরম? আমার সহস্র প্রাণ আমি তোমার পায়ের নখের কাছে বিলিয়ে দিলাম। কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা—পদনখে পড়ে আছে তারি কতগুলা। রাধা, আমি তোমার সমুদ্রেই ডুব দিলাম, আমাকে তুমিই পূর্ণ করো। গ্রাম্য সুরে এরই প্রতিধ্বনি বেজেছিল—কোথায় পাব কলসী কন্যা, কোথায় পাব দড়ি, তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুব্যা মরি।

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল

দু-কূল বহিয়া যায় ঢেউ।

গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ

তরণী রাখিতে নাহি কেউ॥

দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।

কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান

জানিয়া চড়িলুঁ কেনে নায়॥

নেয়ের নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়

কুটিল নয়ানে চায় মোরে।

ভয়েতে কাঁপিছে দে এ-জ্বালা সহিবে কে

কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥

অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল

পরান হইল পরমাদ।

জ্ঞানদাস কহে সখী থির হইয়া থাক দেখি

এখন না ভাবিহ বিষাদ॥

এই ভাবেই অন্য একদিন বৃন্দাবনের মানস-হ্রদের তীরে মেঘলা আকাশের নিচে, সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে রাধা উপস্থিত হলেন। ওপারে যাবেন। আজ খেয়া পারাপার বন্ধ। মাঝি নেই। কেবল একজন নবীন মাঝি নৌকা নিয়ে এগিয়ে এল। সাহসভরে রাধা তাতেই সখীদের নিয়ে উঠলেন। মাঝ-নদীতে নৌকা যখন টলমল করছে তখন রাধাব ভয়াকুল অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এই পদে। দেখতে দেখতে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে গেল, মেঘ আরো ঘনীভূত হল আকাশে। কৃষ্ণ যেন অপটু মাঝি। বেপথু তরণী, কম্পমানা রাধা। কৃষ্ণ রাধাকে আলিঙ্গন করে অভয় দেওয়াতে রাধার প্রমাদ আরো বাড়ে। বেলা বয়ে যায়। নৌকাও পারে পৌছল না—এখন কী হবে? কবি বলছেন—স্থির হও শ্রীমতী, এখন আর বিষন্ন হোয়ো না।

৩৫

শুন বিনোদিনী ধনি আমার কাণ্ডারী তুমি
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।
তুয়া অনুরাগ প্রেম- সমুদ্রে ডুবেছি আমি
আমারে তুলিয়া করো পারে॥
যোগী ভোগী নাপিতানী তোমার লাগিয়া দানী
ওঝা হইলাম তোমার কারণে।
তুয়া অনুরাগে মোরে লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে
তুয়া লাগি করিলুঁ দোকানে॥
রাখাল হইয়া বনে সদা ফিরি ধেনু সনে
তুয়া লাগি বনে বনচারী।
আমার পিরীতি পাইয়া এ ভাঙা তরণী লইয়া
তুয়া লাগি হইলুঁ কাণ্ডারী॥
না বোল কুবোল ধনি রমণীর শিরোমণি
তুয়া প্রেমে কি না করি আমি।
দাস জগন্নাথে কয় না ঠেলিহ রাঙা পায়
জাতি জীবনধন তুমি॥

বিব্রত রাধা যখন নৌকার উপরেই কৃষ্ণকে তিরস্কার করতে লাগলেন, তখন তার জবাবে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তুমি আমাকে তোমার কাণ্ডারী বলছ কেন? প্রকৃতপক্ষে তুমিই আমার কাণ্ডারী। তোমার অনুরাগ-সমুদ্রে আমি ডুবন্ত মানুষ, তুমি দয়া করে আমাকে পার করে দাও। তোমার জন্যে কত ছদ্মবেশ ধারণ করেছি—কখনো যোগী, কখনো ভোগী, কখনো নাপিতানী, দানী ও চিকিৎসক—শুধু তোমার দেখা পাব বলে, তোমার ঈষৎ স্পর্শ পাব বলে, দুটো কথা বলব বলে। ঘরে ঘরে ফিরেছি, রাখাল হয়ে বনচারী হয়েছি তোমারই প্রেমে। এই যে ভাঙা নৌকায় হাল ধরেছি সেও তোমাকে ভেবেই। এখন আমাকে তোমার রাঙা চরণ দুখানি থেকে বঞ্চিত কোরো না, এই মিনতি।

মোহন বিজন বনে দূরে গেল সখীগণে
একলা রহিল ধনী রাই।
দুটি আঁখি ছলছলে চরণ-কমল-তলে
কানু আসি পড়ল লোটাই ॥
জনম সফল ভেল মোর।
তোমা হেন গুণনিধি পথে আনি দিলা বিধি
আনন্দের কি কহিব ওর ॥
রবির কিরণ পাইছে চান্দ মুখ ঘামিয়াছে
মুখর মঞ্জীর দুটি পায়।
হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও সে মোর আঁখি
চন্দন চর্চিত করি গায় ॥
এতেক মিনতি করি রাইয়ের করেতে ধরি
বসায়ল নিজ পীতবাসে।
নির্জন নিকুঞ্জ বনে মিলল দোঁহার সনে
মনে মনে হাসে বংশীদাসে ॥

এই রকম নির্জন অরণ্যপথে কোনো একদিন পথশ্রমে ক্লান্ত রাধা সঙ্গিনীদের ছেড়ে পিছিয়ে পড়েছেন। যমুনার তীরে তপ্ত বালুকায় যার কোমল চরণকে পীড়িত দেখে কৃষ্ণের আঁখিপদ্ম সজল হয়েছিল, সেই রাধাকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখে আজ আর কৃষ্ণ মহাদান প্রার্থনা করলেন না। ক্লান্ত প্রেমাস্পদার স্বেদাক্ত মুখ দেখে কৃষ্ণের হৃদয়ে জেগেছে প্রেমিকের শুশ্রূষার প্রেরণা। কৃষ্ণ বলছেন— আজ আমার জন্ম সফল। হে সুন্দরী, তুমি তোমার পীড়িত চরণ দুখানি আমার বুকের উপর রাখো। তাতে তোমার কী লাভ জানি না। আমার আঁখিতে নামবে স্নিগ্ধতা। নিজের পীত বসনের উপর অনেক মিনতি করে প্রথম প্রেমে লজ্জাবনত নায়িকাকে কৃষ্ণ বসালেন।

৩৭

হেদে লো বিনোদিনী

এ-পথে কেমতে যাবে তুমি।

শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার বোলে

সকলি কিনিয়া নিব আমি॥

এ ভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধূলা

কমল জিনিয়া পদ তোরি।

রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড়ো দুখ

শ্রমভরে আউলাইল কবরী॥

অমূল্যরতন সাথে গোঙায়ের ভয় পথে

লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।

তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী

তিল আধ না যাও ছাড়িয়া॥

মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ

মোর কাছে বৈস বিনোদিনী।

বংশীবদনে কয় এই সে উচিত হয়

শ্যাম সঙ্গে করো বিকিকিনি॥

নিজের বসনের উপর রাধাকে বসিয়ে কৃষ্ণ বললেন—ওগো পসারিনী, কী আছে তোমার পসরায়? এই ঘোর দুপুরে, দারুণ রৌদ্রতাপে তপ্ত পথের ধূলা পেরিয়ে তুমি কেমন করে যাবে? সোনামুখে রোদ লেগে রক্ত ফেটে পড়ে। পথশ্রমে কবরী খসে পড়েছে। কী দরকার এই দীর্ঘ পথপরিক্রমার। তার চেয়ে এসো, এখানে বসো।

এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি

কোমল করুণ ক্লান্ত কায়।

কোথা কোন্ রাজপুরে যাবে আরো কত দূরে

কিসের দুরূহ দুরাশায়।

সম্মুখে দেখ তো চাহি পথের যে সীমা নাহি
তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।
পসারিনী কথা রাখো দূর পথে যেয়ো নাক
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলীরবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ ॥
সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু-অনুরাগে মোর তনু-মন মাতল
না শুনে ধরম লবলেশ ॥
নাসিকা হো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন্ ঠাম ॥
গৃহপতি তরজনে গুরুজন গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ যদি হয় অনুরত
পুছত গোবিন্দদাস ॥

কৃষ্ণরূপ প্রথম দু-চোখ ভরে দেখে, তাঁর একটুখানি হাতের ছোঁয়া পেয়ে রাধার সারা দেহমন আনন্দে বিভোর। তাঁর বাঁশির সুরে, রাধা বলছেন, আমার সারা শ্রবণ পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, অন্য প্রসঙ্গে আর তার মতি নেই। সখীরা, তোমরা আর আমাকে কী উপদেশ দেবে? আমার মুখে আর অন্য কথা নেই। আমার বাতাস তাঁর অঙ্গের সৌরভে পরিপূর্ণ। আমার ধর্মের কথায় আর কোনো লাভ নেই। এখন সংসারের তর্জন-গর্জন, সমালোচনায় আমার শুধু হাসি পায়। আমার কেবল এক চিন্তা, যদি সে আমাকে ভালবাসে।

৩৯

দেইখ্যা আইলাম তারে—
সই দেইখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥
বান্ধ্যাচে বিনোদ চূড়া নব-গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি-কুল নাহি গেল রাখা
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব-হেলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহকর্ম করিতে আল্যায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ॥

এবার দু-চোখ ভরে দেখেছেন তাঁর রূপ। দেখে উচ্চারণ করেছেন সেই প্রসিদ্ধ উক্তি—এক অঙ্গে এত রূপ কখনো না ধরে। এ শুধু আর রূপাবিষ্টার সাধারণ স্বীকৃতি নয়—গভীর প্রেমের প্রেরণা রয়েছে এই উচ্চারণের পিছনে। বিনোদচূড়ার উপরে ময়ূর-পাখনা, চন্দনচর্চিত স্নিগ্ধ তনু স্মৃতিতে যখনই জেগে উঠেছে তখনই মনে হয় জাতি-কুল-শীল আর নাহি গেল রাখা। গৃহকর্মে মন বসে না—সেই প্রেমের ঘোর রাধার সারা চেতনায়।

৪০

পহিলহি রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় তুলহ দূরে রহু কেলি ॥
অনুনয় করইতে অবনত-বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়ান ॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
করে কর বারইতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥
হাসি দরশি মুখ ঝাঁপলি গোরি।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥

এর পরে ঘটল প্রথম মিলন। শঙ্কিত রাধা লজ্জায় কম্পান্বিতা। পরিচয়ই দুর্লভ এখনও। মিলন-লীলা তো দূরের কথা। কৃষ্ণ অনুনয় করছেন। রাধা নতমুখে চকিতে চেয়ে দেখে মাটিতে নখের দাগ কাটতে লাগলেন। কৃষ্ণ রাধার আঁচল স্পর্শ করলেন। শশব্যস্ত রাধা দুই হাত দিয়ে রোধ করতে গেলে কৃষ্ণের হাতে হাত ঠেকে গেল। নব অনুরাগিনী মুগ্ধা রাধা এই ঈষৎ স্পর্শেই পুলকে এবং সরমে প্রেমের সঞ্চার অনুভব করলেন। কৃষ্ণ আজ এতদিনে বলতে পারেন—প্রিয়াকে আমার পেয়েছি আজিকে ভরেছে কোল। আজ চিরদিনের কাঙাল যেন ঘট পূর্ণ করে কনকধন লাভ করল। রাধা পরম লজ্জায় হেসে ফেলে তৎক্ষণাৎ দ্বিগুণ লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেললেন। যেন রত্নদান করে আবার ফিরিয়ে নিলেন। আজ প্রথম মিলন। এর কোনো উপমা নেই।

৪১

শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে মোর নিবেদন।
তোমার অদ্ভুত গুণে সদা করে আকর্ষণে
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥

তোমার মধুর বাণী সুধাসিন্ধু-তরঙ্গিনী
মোর কর্ণ তাহে ডুবি থাকে।
তোমার গৌর দেহ পরম সুগন্ধি সহ
উনমত করিল আমাকে ॥

সখাগণ সঙ্গে থাকি সুবল তাহার সাথী
তোমা বিনে আন নাহি ভায়।
বিরলে বসিয়ে যবে তোমারে দেখিয়ে তবে
কহ তুমি আমার উপায় ॥

এই প্রথম অথচ নিবিড় প্রেম শেষ পযন্ত রূপান্তরিত হয় গভীর পূজায়। কৃষ্ণ বলছেন সেই গভীরতম বাণী। ত্বমসী মম জীবনং। তুমি আমার প্রাণ, প্রাণের অধিক প্রাণ। তুমি যখন কথা বলো আমার সকল শ্রবণ সেই অমৃতসায়রে যে ডুবে থাকে। তোমার গৌর দেহের সুগন্ধে আমি দিশাহারা। তুমি ছাড়া আর কিছু জানি না। প্রিয়তমে যখন একা বসে থাকি তোমাকেই দেখি কল্পনায়। এখন বলো আমার কী উপায়?

৪২

ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া॥
নূপুর হয়্যাছে সোনা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া॥
বনমালা হল্য পুষ্প কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া॥
মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া॥
এ সকল সখা হল্য কি পুণ্য করিয়া।
যাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া॥
শ্রীরঘুনন্দন রটে দু-পাণি জুড়িয়া।
এ সব না জানা যায় ভাবিয়া ভাবিয়া॥

একই পূজার পরম স্তুতি রাধার হৃদয়েও গুঞ্জরিত। নূপুর সোনা হতে পেরেছে কী সৌভাগ্যে? সে আমার বন্ধুর চরণে ঠাঁই পেয়েছে। কী পুণ্যফল আছে সে বনফুলের—মালা হয়ে সে দুলে দুলে উঠছে আমার বন্ধুব বুকে? বেণুবনে ছিল অকিঞ্চন বংশখণ্ড। কী পুণ্যে সে বাঁশি হয়েছে—বন্ধুর অধবামৃত পান করে সে ঝংকৃত। পদকার বলছেন, শুধু ভেবে এ-কথা কেমন করে বুঝবে রাধারানী? চিন্তায় এর অন্ত নেই।

জীবন চাহি যৌবন বড়ো রঙ্গ

বসন্ত নিশীথে বঁধু
লহো গন্ধ লহ মধু
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো

৪৩

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরানে পরান বান্ধা আপনা আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
দুগ্ধে আর জলে প্রেম কিছু রহে স্থির।
উথলি উঠিলে দুগ্ধ জল পাইলে ধীর ॥
ভানু-কমল বলি সেহ হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয় ॥
চাতক-জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল ॥
কি ছাঁর চকোর-চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে ॥

কবি বলছেন এমন প্রেমকে তুলনা দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায় না। উভয়ের আলিঙ্গনে উভয়ে বিরাজ করছেন, অথচ বিচ্ছেদের দুঃস্বপ্নে দুজনেই আকুল। কারো এক পলকের অদর্শনেও যেন জলছাড়া মাছের মতো সহ্যাতীত যন্ত্রণা জাগে। জগতে এমন প্রেমের কথা শোনা যায় না। সূর্য আর পদ্মের তুলনা দেব কী করে—পদ্ম শীতের আঘাতে মরে যায়, সূর্যের তো কিছু আসে যায় না। মেঘ আর চাতকের উপমা দিতে বলছ, মেঘের সুসময় না হলে সে এক কণা জলও চাতককে দেবে না। ফুল আর ভ্রমরের কথাই বা কী বলি, ভ্রমর না এলে তো ফুল যেচে মধু দান করবে না। চকোর চাঁদও এদের দুজনের সমান নয়।

জীবন চাহি যৌবন বড়ো রঙ্গ।
তবে যৌবন যব সুপুরুখ-সঙ্গ॥
সুপুরুখ-প্রেম কবহুঁ জনি ছাড়ি।
দিনে দিনে চান্দকলা সম বাড়ি॥
তুহুঁ যৈছে রসবতী কানু রসকন্দ।
বড়ো পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহুঁ যদি কহসি কবিয়ে অনুসঙ্গ।
চৌরি-পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপগুণবতীক ইহ বড়ো কাজ॥

প্রথম মিলনের পরেও লজ্জা-সংকোচ-ভীতির অবসান হয় না। রাধা বুঝে উঠতে পারছেন না এই নবীন অভিজ্ঞতার জের টানা আর উচিত হবে কি না। রাধার বন্ধু হিসাবে মহাজন পদকার বলছেন, জীবন সুন্দর সন্দেহ নেই—কিন্তু যৌবনের আনন্দ তদপেক্ষা অনেক বেশি। পরম রসিকের সঙ্গে পরম রসবতীর প্রেম এ জগতেও বহু পুণ্যের ফলে ঘটে। প্রেমের সঙ্গে চৌর্যের নিষিদ্ধতা জড়িয়ে থাকলে যৌবনের আনন্দের উত্তেজনা লাখগুণ বেড়ে যায়। হে রূপগুণবতী, এতে তোমার কোনো লজ্জা নেই।

৪৫

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরান পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই কি আর বলিব।
যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বলো কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে বন্ধু পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাই আগুনি॥

শুধু যে রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, শুধু যে প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ, তাই নয়—হৃদয়ের জন্য হৃদয়ের আকুলতাও তীব্র। রাধা বলছেন তাকে দেখার জন্য, বারেক তাকে স্পর্শ করার জন্য আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগে। তার মৃদু-মৃদু হাসিতে মধুধারা। তার প্রেমের জন্য আমার প্রাণে জেগেছে অস্থিরতা। গুরুজনদের মাঝখানে শ্যামপ্রসঙ্গ উঠলে পুলকাঞ্চিত হয় সারা শরীর। পুলক ঢেকে রাখার কত চেষ্টা করি, কিন্তু সে পুলকে চোখে বয়ে যায় জলের ধারা। ঘরবাসী সকলে আমার অবস্থা দেখে কানাকানি করে। রাধা বলছেন, তাতে

আমার লজ্জা নেই—সকল লজ্জায় আগুন দিতে চাইছে এই প্রেমের বোধ। এই নিবিড় বেদনার সঙ্গে পুলকের অনুষঙ্গে রাধার প্রেম অবিস্মরণীয়—দেহের আকর্ষণ তাই প্রেমের আরাধনারই বিশেষ রূপ।

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে।
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ 'পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৪৬

হাথক দরপণ, মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার।
দেহক সরবস, গেহক সার॥
পাখিক পাখ, মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয়॥

রাধা বলছেন, এত ভালবাসি তোমায় যে আমার মনে হয় তুমি আমার হাতের দর্পণ, তুমি আমার মাথার ফুল। প্রিয়তম, তুমি আমার চোখের কাজল, তুমি আমার গলার হার। দেহের সর্বস্ব। গৃহের সার। পাখির যেমন পাখা, মাছের যেমন পানি, প্রাণীর যেমন প্রাণ আমার তেমন তুমি। কিন্তু এত বলেও রাধার তৃপ্তি হল না। তবু জিজ্ঞাসা করছেন—মাধব তুমি যে কে আমি বুঝতে পারি না। কবি বলছেন, তোমরা দুজনেই দুজনার কাছে ঐরকম।

৪৭

সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।

আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দরিদ্রের হেম॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব বলিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি মুখানি হেরয়ে
আঁচরে মোছায়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঞি সদাই লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমাইতে আন নাহি চিতে
রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরীতি
আর কি জগতে আছে॥

- - - - -

রাধা বলছেন—বন্ধুর ভালবাসার কথা কী বলব। সে আমাকে এক নিমেষের জন্যও চোখের আড়াল করে না। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন করে স্বর্ণ-সঞ্চয় আগলে রাখে, এক মুহূর্ত পলক ফেলতে প্রত্যয় হয় না, সে তেমনি করে আমাকে তার দৃষ্টির মধ্যে রাখে। আমার বক্ষের স্পর্শ নিজ বক্ষে লাভ করবে বলে সে সেখানে চন্দন মাখে না—পাছে মিলনে বাধা সঞ্চার হয়। আমার গায়ের ছায়ায় সে ছায়া মেলায়। আমাকে কোলে নিয়েও তার মনে হয় আমি কত দূরে।

ভালোবাসো কিনা বাসো বুঝিতে পারি নে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি
সর্বগ্রাসী আঁখি।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৪৮

পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরান নিছনি দিয়ে।
খড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে ॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মোছাঞা
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
কতেক যতনে পাইয়া রতনে
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥
কত না আদরে রসের বাদরে
নিমগন কৈল মোরে।
তিলে না দেখিলে নিমিখ তেজিলে
ভাসয়ে নয়ান লোরে ॥
সে হেন নাগর রসের সাগর
গুণের নাহিক সীমা।
দাস গোবিন্দে কহয় আনন্দে
তুমি সে জানো মহিমা ॥

প্রেমিকের উপর পরম বিশ্বাস স্থাপন করে রাধা বলছেন যে তার আলাই বালাই নিয়ে আমি জীবন বিলিয়ে দিতে পারি। সে হাত দিয়ে আমার মুখখানি মুছিয়ে নেয়। প্রদীপখানি তুলে ধরে আমার মুখ দেখে দেখে তার তৃপ্তি হয় না। একতিল আমাকে না দেখলে তার চোখের জলে চোখ ভেসে যায়।

৪৯

সে যে বৃষভানু-সুতা।
মরমে পাইয়া বেথা ॥
সজল নয়ান হৈয়া।
রহে পথপানে চাঞা ॥
ফুল-শেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানি হৈয়া ॥
উজর চান্দনি রাতি।
মন্দিরে রতন-বাতি ॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান ॥
সকল বিফল হৈল।
আধেক রজনী গেল ॥
শ্যামবন্ধুর পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস ॥

উৎকণ্ঠিতা রাধা প্রতীক্ষা করছেন কৃষ্ণের জন্য। প্রতিদিনের সংসার যাত্রার শেষে নিভৃত রাত্রির মিলন। কৃষ্ণ বিনা রজনী ব্যর্থ। 'যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।' গোপন মিলনের সকল আয়োজন বুঝি বিফলে যায়। মন্দিরের রতন বাতি, উজ্জ্বল চাঁদনি রাত আজ বুঝি সবই বৃথা। বড়ু চণ্ডীদাস বলছেন, আমি নিজেই যাব তোমার দূত হয়ে, রাধা, তুমি ভেবো না।

মাধব কি কহব ধনিক সন্তাপ।
চীতহিঁ তোহারি এ-দরশ দুরাপ॥
বিরহক বেদনে সো বরনারী।
নিরজনে বিরচই মূরতি তোহারি॥
দারুণ দৈব ততহিঁ লাগ নেল।
লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥
লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়লহি ধন্দ॥
ভাঙু ধনুয়া ভেল লোচন বাণ।
অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান॥
পুন কিয়ে লিখব যতন করি তোয়।
ভীতক চীত-পুতলি ভেল সোয়॥
গোবিন্দদাস কহই করি সেবা।
শুনইতে সো ভেল মরকত-দেবা॥

কৃষ্ণের আগমনে দুর্যোগ—অনুপস্থিতিতে মর্মদাহ। কৃষ্ণের অদর্শনে বিরহিণী বসে বসে কৃষ্ণেরই চিত্র রচনা করেন। আঁকতে বসেও শান্তি নেই। ছবির কৃষ্ণও কম মর্মদাহী নয়। মুখ আস্তে আস্তে চন্দ্রপ্রকাশের সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হল, ভ্রূ হয়ে উঠল অতনুর ধনু—দৃষ্টি হল অতনুর শর। অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের আহ্বান। চিত্রার্পিত রাধা নিজেই শেষটা ভিত্তিগাত্রের ছবির মতো স্থির হয়ে গেলেন। কৃষ্ণও যেন শুনতে শুনতে সেই রকমই হলেন।

৫১

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার কোণে বন্ধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরান ফাটে॥
সই কি আর বলিব তোরে।
কোন্ পুণ্য ফলে সে হেন বন্ধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈলুঁ।
আহা মরি মরি সংকেত করিয়া
কত না যন্ত্রণা দিলুঁ॥
বন্ধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বন্ধুর পিরীতি
শুনিয়া জগৎ সুখী॥

আবার কোনো রাত্রে বা দারুণ দুর্যোগ মাথায় করে দুঃসাহসী নায়ক নায়িকার আকর্ষণে এসে উপস্থিত। ঘর থেকে তাই দেখে রাধার যন্ত্রণার অন্ত নেই। বোধহয় বিলম্বে ঘর থেকে বার হওয়ার জন্য সংকেত-কুঞ্জে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হয়নি। কৃষ্ণ এসেছেন মেঘের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে। রাধা কলঙ্কের ভয়ে পরিবার-পরিজনদের সম্মুখ দিয়ে কৃষ্ণের কাছে চলে যেতে পারছেন না। দুর্যোগ নিশীথে দুঃসাহসী নায়কের নিবিড় প্রেমাকুলতা দেখে রাধার মনে হচ্ছে

যে সকল কলঙ্ক তুচ্ছ করে এই তুচ্ছ সংসার-যাত্রা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। কী আশ্চর্য এই প্রেম, নিজের দুঃখকে সুখে রূপান্তরিত করেছেন কৃষ্ণ।

পান্থ প্রেমের এই গুরুভার
তুমি ছাড়া বলো বইবে কে ?
তোমার আঙিনা দিয়ে ভিজে যাই
দ্বার খোলো বঁধু তাই দেখে।

(বিষ্ণু দে)

৫২

ধনি সহজে রাজার ঝি।

ঘরের বাহির কখনো না হয়

আমরা দেখিয়াছি ॥

তাহাতে রজনী কানন মাঝারে

করয়ে কমল-শেজ।

মিনতি করিয়া প্রিয় সখীগণে

কানুক উদ্দেশে ভেজ ॥

সবহুঁ রজনী নিন্দ যায়ে ধনি

রতন পালঙ্ক পরে।

সে যে কমলিনী জাগয়ে যামিনী

নিমিখ না দেই ডরে ॥

কর পদতল ও থল-কমল

ননির পুতলি দেহ।

সে যে সুকুমারী কান্দয়ে গুমরি

এত না সহিবে কেহ ॥

এ ঘর বাহির করে কতবার

কপট শঠের আশ।

এতহুঁ বিপদ সহিতে না পারি

ধায় কানুরাম দাস ॥

কাজেই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার ভারে পীড়িতা নায়িকা শেষে সখীদের পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে। তারা দেখেছে চির সুখের ক্রোড়ে লালিতা সেই আদরিণী কন্যা কখনও ঘরের বাইরে সচরাচর যায় না। তারা এখন দেখছে ঘোর নিশীথে অরণ্য-নিভৃতে সে এখন প্রতীক্ষায় স্থির। সে চোখের পলক পর্যন্ত ফেলে না—এই ভয়ে যদি এক নিমেষের জন্যও তার কৃষ্ণ আড়ালে চলে যায়। গুমরে গুমরে সে কেঁদে-কেঁদে রাত পোহায়। আর ঘর বার করে।

রতি-রস ছরমে শ্যাম হিয়ে শূতলি
শরদ-ইন্দুমুখী বালা।
মরকত-মদনে কোই জনু পূজল
দেই নব চম্পকমালা॥
শ্যাম-বয়ন পর বয়ন বিরাজই
উর পর কুচ-যুগ সাজে।
কনক-কুম্ভ জনু উলটি বৈসায়ল
মদন-মহোদধি মাঝে॥
জোড়ল তনুমন ভুজে ভুজে বন্ধন
অধরহিঁ অধর মিশান।
বেঢ়ল মৃণালে হেম নীলমণি জনু
বান্ধুলি যুগ একঠান॥
ঘন সঞে দামিনী দু-কূলে দু-কূল জনু
দুহুঁ জন এক পটবাস।
চরণ বেঢ়ি চারু অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দদাস॥

কোনো কোনো শুভমুহূর্তে প্রিয়সঙ্গম ঘটে। শবীরী মিলনের শেষে শ্রান্ত রাধা কৃষ্ণের বক্ষে বক্ষলগ্ন করে শায়িত। দেখে মনে হয় মরকত মণিতে নির্মিত অতনু দেবতাকে কেউ যেন নব চম্পকের মালা দিয়ে পূজা করে গেছে। কৃষ্ণের মুখের উপর রাধা রেখেছেন নিজের মুখ। তাঁর বুকের উপর রেখেছেন নিজের বুক। যেন কামনার নীল মহাসমুদ্রে কেউ কনক কলস দুটি উজাড় করে উপুড করেছে। অধরে অধর, বাহুতে বাহু। যেন মেঘের বুকে বিদ্যুতের রেখা। দুজনের বসনের সঙ্গে বসন মিশে গেছে—যেন একই পট্টবাস দুজনে পরে আছেন।

৫৪

নিধুবনে শ্যামবিনোদিনী ভোর।

তুহুঁক রূপের নাহিক উপমা

প্রেমের নাহিক ওর॥

হিরণ কিরণ আধ বরণ

আধ নীলমণি-জ্যোতি।

আধ উরে বন- মালা বিরাজিত

আধ গলে গজমোতি॥

আধ শ্রবণে মকর-কুণ্ডল

আধ রতন-ছবি।

আধ কপালে চান্দের উদয়

আধ কপালে রবি॥

আধ শিরে শোভে ময়ূর-শিখণ্ড

আধ শিরে দোলে বেণী।

কনক-কমল করে ঝলমল

ফণী উগারয়ে মণি॥

মন্দ পবন মলয় শীতল

কুন্তল উড়য়ে বায়।

রসের পাথারে না জানে সাঁতার

ডুবল শেখর রায়॥

মিলনে রাধা এবং রাধানাথের রূপের সীমা নেই। কেননা দুজনের প্রেমেরও সীমা নেই। রূপের অধিষ্ঠান তো সপ্রেম মিলনে। দুজনের পূর্ণ মিলনের ফলে কাউকেই স্বতন্ত্রভাবে সম্যক দেখা যাচ্ছে না। দুজনের অর্ধাংশই দৃষ্টিগোচর মাত্র। আধেক সোনা আর আধেক নীলমণি। কিছু বনমালা, কিছু গজমোতি। কিছু মকর কুণ্ডল, কিছু রতন-ছবি। কিছু বেণী আর কিছুটা ময়ূরের পুচ্ছ। এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে। রসের পাথারের মাঝে কবি অসহায়।

৫৫

তুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দিবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল।
নবঘন মাঝে যেন বিজুরী পশিল॥
রাই-কানু-রূপের নাহিক উপাম।
কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠাম॥
রসের আবেশে তুহুঁ হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর॥

রাধা-কৃষ্ণের মিলিত শ্রী বর্ণনায় বৈষ্ণব কবির শ্রান্তি নেই। উপমায় বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের আহ্বান করেও তাঁদের আশ মেটে না। স্বর্ণলতা যেন কালো তমালের চারদিকে বেষ্টন করেছে—কৃষ্ণ আলিঙ্গিত রাধাকে দেখে তাই মনে হয়। আর কৃষ্ণ যখন বিপুল আবেগে রাধাকে আলিঙ্গন করে বুকে টেনে নেন, তখন মনে হয় যেন নব জলধরের শ্যাম অঙ্গে বিদ্যুতের তন্বীরেখা মিলিয়ে গেল।

৫৬

তুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
তুহুঁ রূপ নিতি নিতি তুহুঁ হিয়ে জাগ॥
তুহুঁ মুখ চুম্বই তুহুঁ করু কোর।
তুহুঁ পরিরম্ভণে তুহুঁ ভেল ভোর॥
তুহুঁ তুহেঁ যৈছন দারিদ-হেম।
নিতি নব আরতি নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস॥

এই ভাবেই নবীন প্রেমের নিত্যলীলা। দুজনের হৃদয়ে দুজনের রূপারতি। দুজনের অঙ্কে দুজনে। উভয়ে উভয়ের মুখ চুম্বন করেন। দেহের মিলন পরিপূর্ণতায় যায়। দুজনের কাছেই দুজনে যেন দরিদ্রের কাছে স্বর্ণভাণ্ডার। কবি এই নিত্যলীলা-বিলাস দেখে মুগ্ধ।

৫৭

হামে দরশাইতে কতহুঁ বেশ করু
হামে হেরইতে তনু ঝাঁপ।
সুরত-শিঙ্গারে আজি ধনি আয়লি
পরশিতে থরহরি কাঁপ॥
শুন হে কানুক ইহ অবধারি।
সকল কাজ হাম বুঝলুঁ বুঝায়লুঁ
না বুঝলুঁ অন্তর নারী॥
অভিমত কাম নাম পুন শুনইতে
রোখই গুণ দরশাই।
অরি সম গঞ্জয়ে মন পুন রঞ্জয়ে
আপন মনোরথ সাই॥
অন্তরে জিউ অধিক করি মানয়ে
বাহিরে লাগয়ে উদাস।
কহ কবিশেখর অনুভবে জানলুঁ
বিদগধ কেলি-বিলাস॥

আক্ষেপ করছেন কৃষ্ণ। বলছেন যে নারী চরিত্র বুঝতে পারলাম না। আমি দেখব বলে তার সযত্নে রচিত বেশভূষা। অথচ আমাকে দেখলে পরে লজ্জায় সে সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলে। সে আসে আমার কাছে কাম-কেলির জন্য—কিন্তু একটুকু ছোঁয়ায় সে কম্পান্বিত কলেবর। একবার সে ভর্ৎসনায় মুখর, আবার পর-মুহূর্তেই সে অনুরাগবাণীতে গদগদ। অন্তরে সে যা গভীরভাবে বাসনা করে, বাইরে তার সম্বন্ধে তার এত ঔদাস্য কেন?

তোমায় পাছে বুঝিতে পারি তাই কি এত লীলার ছল,
বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে চোখের জল॥
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছনে বেঢ়ল হেম॥
কনকলতায়ে জনু তরুণ তমাল।
নব-জলধরে জনু বিজুরী রসাল॥
কমলে মধুপে যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেমতরঙ্গ॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান॥

দুজনের তনু একসঙ্গে যেন আনন্দিত প্রেমতরঙ্গ। তরুণ স্বর্ণলতিকা বেষ্টিত তরুণ তমাল-প্রতিম রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ। কিংবা কমল মধুপান প্রমত্ত মধুকর যেন কমলের উপর স্থির—এমনই সেই যুগল লীলা।

নয়ানে নয়ানে থাকে রাতি দিনে
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া মুখানি তুলিয়া
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে॥
সই কি ছার পরান ধরি।
কি তার আরতি কিবা সে পিরীতি
জীতে পাসরিতে নারি॥
নিশ্বাস ছাড়িতে গুণে পরমাদে
কাতর হইয়া পুছে।
বালাই লইয়া মো মরোঁ বলিয়া
মোর পরসাদ যাচে॥
না জানি কি সুখে দাঁড়াঞা সমুখে
জোড় হাতে কিবা মাগে।
যে করয়ে চিতে কে যাবে প্রতীতে
বলরাম চিতে জাগে॥

রাধা বলছেন কানুর ভালবাসার কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সে প্রেম-তরঙ্গ-লীলা কারো বিশ্বাসও হবে না। নয়নের মাঝখানে রেখেও তার তৃপ্তি নেই। আমার দীর্ঘনিশ্বাসে সে প্রমাদ গণনা করে। আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে সে যেন সদা-সর্বদাই কী যাচ্ঞা করে। তার আর্তি, তার প্রেম দুইই আমার পক্ষে ভোলা অসম্ভব।

সই পিয়া সে পিরীতি জানে।

যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি
নিছনি দিয়ে পরানে॥
মো যদি সিনাঙ আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গ-জল পরশ লাগিয়া
বাহু পসারিয়া ধায়॥
বসনে বসন লাগিবে বলিয়া
একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়া নেয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবাব লাগি
ফিবয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গেব বাতাস যে দিগে
সে মুখে সে দিন থাকে॥
মনের আকূতি বেকত করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক এ বায়শেখব
কিছু বুঝে অনুমানে॥

- - - - -

প্রেম-তন্ময় শ্রীকৃষ্ণের আর-এক মূর্তি বর্ণনা করছেন রাধা। রাধা বলছেন—সে আমার জন্য তার সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে। আমি যদি আগের ঘাটে স্নান করি, তাহলে আমার অঙ্গ-পরশিত জলরাশির স্পর্শ পাবে বলে সে পিছনের ঘাটে যায়। আমার বসনের সঙ্গে তার বসনের সংস্পর্শ ঘটবে বলে একই রজকের কাছে কাপড পাঠায়। আমার ছায়ার সঙ্গে তার অঙ্গের ছায়া মিলাবে বলে সে উন্মুখ। আমার অঙ্গের সৌরভের জন্য আকুল হয়ে সে আমার দিকের বাতাসের দিকে সারাদিন মুখ ফিরিয়ে থাকে।

৬১

হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেমপ্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন-গৌরব চৌর-সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি॥
সজনী এত দিনে ভাঙল ধন্দ।
কানু অনুরাগ-ভুজঙ্গে গরাসল
কুল-দাদুরি মতি মন্দ॥
আপনক চরিত আপে নাহি সমুঝিয়ে
আন করত হোয় আন।
ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে
গৃহপতি শপতিক ঠান॥
নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
কত পরমাদ কহই নাহি পারিয়ে
গোবিন্দদাস এক সাখী॥

প্রেম এইবার পরিপূর্ণতার পথে। হৃদয়-মন্দিরে কৃষ্ণের এখন নিশ্চিন্ত সুখ-শয্যা। রাধার প্রেম তাঁর প্রহরী-স্বরূপ, যেন তিনি না চলে যেতে পারেন। যেন বহিরাগত সংসারবিপাক তাঁকে না স্পর্শ করে। সংসার-চিন্তারূপ দাদুরিকে এতদিনে নিঃশেষে গ্রাস করেছে কৃষ্ণ-অনুরাগের নিষ্ঠুর ভুজঙ্গ। সাপের নিষ্ঠুর অনিবার্যতার সঙ্গে প্রেমের দারুণ অপ্রতিরোধ্যতার তুলনা সার্থক। রাধা বলছেন—এখন আর নিজের চরিত্র আমি নিজে বুঝতে পারি না। পরিজনদের প্রবঞ্চনা করতে গিয়ে গৃহস্বামীর শপথ ব্যবহার করি—অথচ তাঁর সঙ্গে অন্য সংস্রব নেই। আর বিপদের উপর বিপদ চোখে কি হয়েছে জানি না, চোখের জল বাঁধ মানে না।

৬২

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইলুঁ
গাঁথিলু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এসব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥
শাশুড়ি ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইলুঁ গহন বনে।
বড়ো সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলব বন্ধুর সনে॥
পথ পানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রস-শিরোমণি আসিব এখনি
বড়ু চণ্ডীদাস ভনে॥

তাই রাধার প্রতীক্ষার ভাবও এবার ধীরে ধীরে দুর্বহ হয়ে উঠছে। মিলন মন্দিরে মাল্য রচনা করে শূন্য শয্যা নিয়ে আর কত জেগে থাকব? তাম্বুল থালিতে প্রস্তুত, দীপ প্রস্তুত বয়েছে তার পথ চেয়ে। কিন্তু তিনি না এলে যে সবই ব্যর্থ। সংসারের সকল পিছুটানকে ছিঁড়ে আমি নিভৃত মিলনকুঞ্জে এসেছি, কিন্তু কই বঁধুয়ার দেখা যে মিলল না।

কান্নায় বিগলিত রাধা বলছেন :

৬৩

শুন শুন নাগর রসিক সুজান।

তুয়া মুখ তিল আধ না দেখিলে হাম কত
কোটি কলপ করি মান॥

তুয়া নব অনুরাগে হাম আয়লুঁ আগে
পথ হেরি আকুল পরান।

তোহারি দরশে অব দূরে গেও তুখ সব
সফল ভেল পাঁচ বাণ॥

হাম অতি দুখিত তাপিত তাহে পরবশ
তাহে গুরু-গঞ্জন বোল।

গৃহের মাঝারে থাকি যেমন পিঞ্জরে পাখি
সদা ভয়ে জিউ উতরোল॥

অনেক পুণ্যের ফলে তোমা বন্ধু পাইয়াছি
কত কত করিয়া কামনা।

হেন মনে অভিলাষি কহি এবে পরকাশি
তুয়া পায়ে নিছিয়ে আপনা॥

তুমি কি জানো প্রিয়তম আধ তিল সময় তোমায় না দেখলে তা আমার কাছে কোটিকল্পপরিমিত কালেব ব্যবধান বলে মনে হয়। আমি তো ঘর করেছি বাহির আর বাহির করেছি ঘর। পথের দিকে চেয়ে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। তুমি এলে, তোমার ছোঁয়ায় জীবন-যৌবন সফল বলে মানি। আমি পরাধীন দুঃখ-পীড়িত সংসার-চক্রে নিষ্পিষ্ট নারী—পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো আশঙ্কায় সদাই উতরোল। অনেক পুণ্যের ফলে তোমাকে পেয়েছি—এখন স্পষ্ট করে বলি আমি তোমার চরণ করেছি শরণ, আমি তোমাতেই নিজেকে উৎসর্গ করেছি।

৬৪

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে ॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

- - - - -

কাজেই আর শুধু প্রতীক্ষার ভারে পীড়িত হয়ে বসে থাকা নয়। হৃদয়-যমুনা এতদিনে সেই প্রেমের বাঁশির গভীর আহ্বানে তরঙ্গ-উদ্বেল। পথ দিয়ে কে যায় গো চলে, ডাক দিয়ে সে যায়, আমার ঘরে থাকাই দায়। এবার অভিসারের সংকট-সঙ্কুল পথের পথিক হবেন রাধা। তাই অভিসারের সাধনা শুরু করলেন নব অনুরাগিণী।

আঙিনায় কাঁটা বিছিয়ে কোমল পায়ে হাঁটা অভ্যাস করছেন। কলস-ভরা জল ঢেলে পিছল পথে নেমে দেখছেন তিনি, পারবেন কিনা। দুই হাত দিয়ে চোখ ঢেকে আঁধার রজনীর বিকল্প রচনা করে পদচারণা করছেন। পায়ের নূপুর বাঁধছেন আঁচলে। সাপের মুখ বন্ধন ওঝার কাছে শিখছেন। তার জন্য খুইয়ে বসছেন হয়তো হাতের বালা। আর দুই কানকে সংসারের সকল আহ্বান সম্বন্ধে বধির করে তুলছেন। সকল নিষেধ হালকা করছেন বিহ্বল হাসি হেসে।

রহিতে নারিনু ঘরে
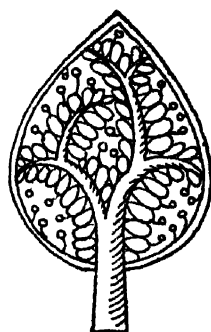
দারুণ বাঁশি কাহে বজাওত
সকরুণ রাধা নাম ॥

৬৫

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়লি পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহিঁ তেজলি সগরি॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহিঁ তেজি চলি যায়॥
যামিনী ঘন-আধিয়ার।
মনমথ হিয়ে উজিয়াব॥
বিঘিনি বিথাবিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরিয়ে আন॥

- - - - -

পড়ে রইল সংসারের সকল পশ্চাদাকর্ষণ। ছিঁড়ে ফেলে সকল বাধা, বিমুখ করে সকল প্রতিকূলতা, রাধা অবতীর্ণ হলেন শঙ্কা-সঙ্কুল পথে। নবীন প্রেমের আবেগে তখন তিনি স্থিরলক্ষ্য। তিনি মানবেন না কোনটা পথ, কোনটা বিপথ। নিঃসঙ্গিনী নায়িকা এবার নিজেই চলেছেন প্রিয়-সন্নিধানে। দ্রুত গমনের পক্ষে যা কিছু মনে হচ্ছে ভার অথবা বোঝা তা সবই পরিহার করলেন পথের ধুলায়। পড়ে রইল মণিময় হার। পড়ে রইল চরণের মঞ্জীর। ফেলে দিলেন হাতেব কাঁকন আর অঙ্গুরীয়। তাঁর চঞ্চল চরণের পক্ষে বক্ষের উন্নত স্তন-সম্পদও তখন যেন তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় বোঝা বলে মনে হচ্ছে। প্রেমের অস্ত্রে সকল বাধাকে ছিন্ন করে, হৃদয়ে জেলে নিয়ে বাসনার প্রদীপ শুরু হল সেই নির্ভীক নায়িকার ক্লান্তিহীন যাত্রা।

৬৬

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদে জিউ কাঁপ
তঁহি দিঠি জারত বিজুরিক জালা
ইথে জনি মন্দির ছোড়ই বালা॥
ঐছন কুঞ্জে একলি বনমালী।
অন্তর জরজর পন্থ নেহারি॥
ভ্রমই ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ার।
তঁহি বরিখত অবিরত জলধার॥
পাঁতর মা ভেল আঁতর বারি।
কৈছে পঙারব সো সুকুমারী॥
গুণি গুণি আকুল চলল মুরারী।
মিলল আধ পন্থে বরনারী॥
গোবিন্দদাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরীখত মনমথ মন্দ॥

আকাশ ঢেকে গেছে নীলনবঘনে। মুহুর্মুহু বজ্রনিনাদে হৃদয় শঙ্কিত। অভিসারিকা রাধার কথা ভাবছেন কৃষ্ণ—আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার। কৃষ্ণ ভাবছেন—বিদ্যুৎশিখায় দৃষ্টি ঝলসে যাচ্ছে। এই দুর্যোগ-ঘন নিশীথে শত শত ভুজঙ্গের দল পথে বেরিয়েছে, অবিরাম জলধারায় প্রান্তর প্লাবিত। রচিত হয়েছে দুস্তর ব্যবধান। কেমন করে সেই কোমলাঙ্গী তরুণী এই বিপদ-বারিধি পেরিয়ে আসবে? এই কথা ভাবতে-ভাবতে কৃষ্ণ নিজেই পথে নেমে এলেন। অর্ধেক পথে সাক্ষাৎ হল। দুজনের প্রেমের পরীক্ষায় দুজনেই জয়ী হলেন।

৬৭

মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তঁহি অতি বাদর দরদর রোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস-সুরধুনী পার ॥
ঘন-ঘন ঝন-ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত ॥
দশদিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার ॥
ইথে যব সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥

আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে-ভবনে। পিচ্ছিল পথে ভয় পদে-পদে। দুরতিক্রম্য বর্ষার ঝাপটকে যেন জয় করা যাবে না। রাধার নীল নিচোল এই দারুণ বর্ষার ধারা কতটা রোধ করবে। মানস-সুরধুনীর পারে রয়েছেন কানু, রাধা যে কেমন করে যাবেন তাই ভাবনার বিষয়। ঘন-ঘন বজ্রনিপাত এবং পলকে পলকে বিদ্যুৎ-বিকাশ, না যায় কিছু শোনা, না যায় কিছু দেখা। এই দারুণ মুহূর্তে রাধা কি তুচ্ছ করেছেন নিজের শরীর ? তাতে আর সন্দেহ কি—নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না, রাধাও তেমনি অনিবার হয়ে উঠলেন।

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই ॥

সজনি, আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি
সংকেত-কুঞ্জহি গেল ॥

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন-ঘন ঘোর।
শ্যাম মোহনে একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর ॥

সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থরথর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ ॥

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারব
জীবন মঝু আগুসার।
রায়শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার ॥

দুর্যোগঘন বর্ষা নিশীথে রাধা ভাবছেন কৃষ্ণ নিশ্চয় অগ্রসর হয়ে মিলনকুঞ্জে এসেছেন। খরবায়ু বয় বেগে। বজ্রনিনাদিত রজনী। আর ঝরঝর বারিধারা ঝরে অবিরল। সজনী, আজ সত্যিই ঘোর দুর্দিন। আমার কথা ভেবে কানু নিশ্চয় উদ্বেগে কম্পমান। কাজেই আমি এখন কেমন করে গৃহগত প্রাণ হয়ে বসে থাকি। সংসারের দৃষ্টি এই ঘোর তিমিরে আবৃত। কিসের বিচার,

কিসের বিবেচনা, এখন ত্বরিত গতিতে শুধু সেই প্রিয় সন্নিধানে চলা। আমার জীবনই যখন অগ্রসর তখন আর কিসের ভয়?

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশীথ যামিনী রে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত
ঘন-ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুৎ পথতরু লুণ্ঠিত,
থরথর কম্পিত দেহ।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মাধব কি কহব দৈব-বিপাক।

পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে

যদি হয় মুখ লাখে লাখ।

মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ

নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।

তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে

পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥

একে কুল-কামিনী তাহে কুহু যামিনী

ঘোর গহন অতি দূর।

আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর

হাম যাওব কোন্ পুর॥

একে পদ-পঙ্কিল পন্থহি বুরল

তাহে শত কণ্টক শেল।

তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ

চির দুখ অব দূরে গেল॥

তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল

ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।

পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণলুঁ

কহতহি গোবিন্দদাস॥

- - - - -

কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে রাধা তাঁকে পথের ক্লেশের কথা বলছেন। মনে হয় যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ। বলছেন—কী করে এক মুখে সেই দুরন্ত পথের কথা বলি? গৃহ ছেড়ে কিছু এগিয়ে আসতেই ডুবে গেলাম অথৈ আঁধারে। পায়ে-পায়ে কুটিল সাপের বেষ্টনী। ক্রূর রাত্রির মাঝে আমি একাকিনী কুল-তরুণী। দুর্যোগের আকাশ অবিরল জল ঢালছে। পঙ্কে আচ্ছন্ন চরণে কণ্টকের আঘাত। কিন্তু না চাহিলে তোমার মুখ পানে হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে। তাই সব দুঃখই আমার কাছে তৃণতুল্য।

৭০

আজি অদ্ভুত তিমির-রঙ্গ
আপনি না চিনে আপন অঙ্গ
নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ
অঙ্কুশ নাহি মান রে।

সাজল ধনি শ্যাম-বিহার
শিথিলীকৃত কবরী-ভার
নীলোৎপল-রচিত হার
কণ্ঠহি অনুপাম রে॥

নীল বসন দোঁহার গায়
কি মেঘে বিজুরী লুকিয়া যায়,
মদন-দীপ পথ দেখায়
অনুরাগ আগুয়ান রে

পরিমল পাই ভ্রমর-পুঞ্জ
বেঢ়ল আসি চরণ-কঞ্জ
মন্দ মন্দ মধুর গুঞ্জ
লালস মধুপান রে॥

মুখ-মণ্ডল শশী উজোর
হেরি ধাওল তহিঁ চকোর
উড়িয়া উড়িয়া হই বিভোর
চাহে পীযূষ দান রে।

পথে পরমাদ হেরিয়া রাই
নীল-বসনে মুখ ছিপাই
সংকেত-বনে মিলল যাই
যাঁহা নিবসই কানু রে॥

রাই-আগমন নিরখি কান
শীতল ভেল তপত প্রাণ
নিজ দয়িতার বাঢ়ায় মান
আদরে আগুসারি রে।
আইস আইস ধরহ হাত
লহু লহু নাথ পুছত বাত
শশী কহে শুন পরাননাথ
আজু বড়ো আন্ধিয়ারি রে॥

আজও ঘোর তিমিরঘন রাত্রি। আপনার শরীর আপনি দেখা যায় না। আকাশ আর রাধা দুজনেই নীলাম্বরে আবৃত। আকাশের মেঘকে আকাশের বসন কল্পনা করা হয়েছে। বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ যেমন বিদ্যুৎকে লুকিয়ে রাখে, নীলবসনও তেমনি লুকিয়ে রেখেছে রাধার থির-বিজুরি অঙ্গকান্তি। রাধার এলোচুলের রাশি আর নীল উৎপলে রচিত কণ্ঠমাল্য—কী অনুপম অভিসারসজ্জা। আজ অতনু যেন পথপ্রদর্শক আর অনুরাগ স্বয়ং যেন পথের পথিক। মুখ ঢেকে রেখেছিলেন রাধা। একটু অনবধানে সে আবরণ সরে যাওয়ায় চন্দ্রোদয় হয়েছে মনে করে চকোর ছুটে এল সুধাপান লালসে। রাধা তখন অভিসারের বিপদ বুঝে আবার মুখ ঢেকে ফেললেন। কৃষ্ণ রাধাকে দেখে এগিয়ে এসে তাঁর সম্মান বাড়ালেন। এসো এসো বলে তাঁর হাত ধরলেন।

৭১

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ মোছই
হেরই চির থির আঁখি ॥
পিরীতি মূরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মিটল
সেই আপনে করু সেবা ॥
হিমকর শীতল নীরহি তিতল
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনী-দলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পন্থকি দুখ ॥
আঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বুল পুরি
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দদাস ভন নিতি নব নৌতুন
রাইক অমিয়া-সিনান ॥

তিনি দ্রুত ব্যস্ততায় এগিয়ে এসে রাধাকে আলিঙ্গন করে রাধাকে কোলের উপর বসালেন। দু-হাত দিয়ে রাধার চরণ-দুখানি মুছিয়ে দিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন সেই পায়ের দিকে। যার দর্শনে সব দুঃখ মিটে যায় তিনি নিজেই সেবা করলেন। শীতল জলে ধুইয়ে দিলেন মুখ। পদ্মপত্রে রাধাকে বীজন করলেন মৃদু মৃদু। জিজ্ঞাসা করলেন পথের দুঃখের কথা। রাধা এভাবেই কৃষ্ণপ্রেম সুধাধারায় নিত্যস্নাতা।

৭২

ভীতক-চিত ভুজগ হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ছাপই
কর দেই ফণী-মণি ঝাঁপ॥
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী
জীবই বহু পুণভাগ॥
যো পদতল থল-কমল-সুকোমল
ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সংকট বাটহি
আয়ত যায়ত নিঃশঙ্ক॥
মন্দির মাঝ সাজ নাহি তেজত
দেহলি মানয়ে দূর।
অব কুহু-যামিনী চলয়ে একাকিনী
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

নিষ্ফল হয়নি রাধার অভিসার-সাধনা। যে স্বভাবভীরু তরুণী ভিত্তি-গাত্রে সাপের ছবি দেখে আতঙ্কিত হত, এখন সে অন্ধকারের আড়ালে সর্বশরীর গোপন করে পথে নেমেছে। সাপের মাথার মণিতে যদি কিছুমাত্র আঁধার ঘুচে যায় তা হলে অভিসার বিপন্ন হবে এই ভেবে হাত দিয়ে নির্ভয়ে এখন সে সাপের মাথার মণি ঢাকা দিতে পারে। স্থলপদ্মের মতো সুকোমল চরণদ্বয় মৃত্তিকাস্পর্শ করতেই একদা ছিল সন্ত্রস্ত। সেই চরণেই এখন কণ্টকময় সংকটপূর্ণ পথে নিঃশঙ্কে আনাগোনা। গৃহাভ্যন্তর ছেড়ে যে কখনও বাহির দুয়ারের চৌকাঠের কাছে আসত না, সে এখন অমা-রজনীর পথে একাকিনী অভিসারিকা।

৭৩

পৌখলি রজনী পবন বহ মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহু ঝাঁপ ॥
এ সখী হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ-কুচ-কঞ্চুক ভরমহি তেজ ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললহি কুঞ্জে লখই নাহি কোই ॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিনি যাহা নূতন লেহ ॥

শুধু যে বর্ষার বজ্র-সচকিত রাত্রি তাই নয়। পৌষের হিমজর্জর রাত্রিতে—যে-রাত্রে গাঢ় কুয়াশায় চন্দ্রালোকও বন্দী থাকে—যে-রাত্রে আর সকলে পৌর-ভবনে সুখ-শয্যাতেও কম্পমান—সেই রাত্রেও রাধার অভিসারে ক্ষান্তি নেই। নিজের সুখশয্যা পরিহার করে, ভ্রমবশত কাঁচুলি ফেলে রেখে, শীতের কুয়াশার সঙ্গে মিল রেখে একটা সাদা কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে, রাধা পথে নেমেছেন। শীতের হিম অথবা পথের কাঁটা কিছুই তাকে বিচলিত করে না। নবীন প্রেমের কাছে কোনো বিঘ্নই যে বিঘ্ন নয়।

৭৪

কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনী মঝু পরিখন করো দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝূর॥
কোটি কুসুম-শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম-দহন-দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ॥

কুলমর্যাদার প্রশ্ন তুলে, বিপদ-আপদের প্রশ্ন তুলে যাঁরা রাধার অভিসারকে খণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন রাধা এখানে তাঁদের উত্তর দিচ্ছেন। বলছেন—আমি কুলমর্যাদার কপাটই যখন গণনা করিনি, তখন কাঠের কপাটের বাধা আর কতটুকু? নিজের কলঙ্কভয়ের সিন্ধুই আমি যখন গোষ্পদের ন্যায় পেরিয়ে এলাম তখন মানস-হ্রদের কাছে আমি হার মানব? অতনুর শর-বর্ষণের চেয়ে বাদল-বরিষণের আঘাত কি দুঃসহ? প্রেমের দহন যন্ত্রণা যখন সহ্য করি তখন বজ্রাগ্নিতে আমার ভয় কি? যার পদতলে আমি নিজের জীবন সমর্পণ করলাম তার কাছে যেতে দেহের মায়া করব?

৭৫

নব অনুরাগে ঘরে রহই না পারি।
গুরুজন পথ ধনি করত নেহারি॥
গুরুজন পরিজন সভে নিন্দ গেল।
দেখি ধনি অতি উৎকণ্ঠিত ভেল॥
বিছুরল আপনক বেশ বনান।
সখীগণ সঞে তব করল পয়ান॥
পুনমিক চান্দ জিনিয়া মুখ-জ্যোতি।
ঝলমল করু তনু কত মণিমোতি॥
থলকমল-দল চরণ সঞ্চার।
নব অনুরাগে কত আরতি বিথার॥
আয়ল মদন-কুঞ্জ গৃহ মাঝ।
না হেরল তাহি বরজ-যুবরাজ॥
বৈঠলি তহিঁ পুন ছোড়ি নিশ্বাস।
নাগর আনিতে চলু বলরাম দাস॥

এক-একদিনের বিড়ম্বনাও কম নয়। কখন নিদ্রিত হবে সারা সংসার, তারই চিন্তায় উৎকণ্ঠিত রাধার প্রাণ যায়। দ্রুত ব্যস্ততায় রাধার বেশ রচনায় বিভ্রাট ঘটে। তা উপেক্ষা করে রাধা যাত্রা করলেন প্রিয়-সন্নিধানে। রূপের আলোকে জ্যোতির্ময়ী রাধার মুখশ্রী পূর্ণিমার চাঁদকেও হার মানায়। সেই কমলচরণের দ্রুত সম্পাতে রাধা মিলনস্থলীতে পৌঁছে দেখেন কৃষ্ণ নেই। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বসে পড়লেন হতাশ নায়িকা। কবি বলছেন, তিনিই দূত হয়ে নায়ককে আনতে যাবেন।

৭৬

কুন্দ কুসুমে ভরু কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার ॥
চন্দন চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর ॥
চান্দনি রজনী উজোরলি গোরী।
হরি-অভিসার রভস-রসে ভোরি ॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই ॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ পুতলি কিয়ে রস মাহা বুর ॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল-কণ্টক কি করয়ে পার ॥
সুরত-শিঙ্গার কিরিতি সম ভাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥

পূর্ণিমার রাত্রিতে সুসজ্জিতা রাধা পূর্ণিমার শুভ্র কিরণের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছেন—পথে যেতে যেতে যেন ধরা না পড়েন। শুভ্র চন্দনে, কুন্দ কুসুমে রাধা আজ অঙ্গে-অঙ্গে অনঙ্গের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। শুভ্রবেশিনী রাধাকে শুভ্র পূর্ণচন্দ্র-কররাশির মাঝখানে আর পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যেন রাঙ্গের পুতুলকে কেউ পারদের বাটিতে ফেলে দিয়েছে—গুরুকুল কণ্টক তুচ্ছ করে রাধা বাসনা পূর্ণ করার জন্য অনিবার হয়ে উঠলেন।

৭৭

সুন্দরি কৈছন আরতি তোর।

বিঘটিত ঘটিত সাজ নাহি জানল

ভুলল মাধব মোর ॥

বিপরীত চীর পহিরি হরি সাজল

তুহুঁ অঙ্গদ তুহুঁ কানে।

সীঁথি বলয় করি হাথে সাজাওল

কুণ্ডল মুদরিক ভানে ॥

কিঙ্কিণী-জাল মাল করি পহিরল

হার সাজাওল হাতে।

চূড়ক সাজ করি চরণহি পহিরল

মঞ্জীর পহিরল মাথে ॥

পুরুব উত্তর নাহি দিগদিগন্তর

নব অনুরাগক লাগি।

বল্লভদাস কহ চঢ়ল মনোরথে

সংকট দূরহি ভাগি ॥

অভিসারের আবেগে দ্রুতব্যস্ততায় রাধার কেমন বেশ বিভ্রাট ঘটেছে তারই কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। রাধা উল্টো করে কাপড় পরেছেন, অঙ্গদ দিয়েছেন কানে। সিঁথিপাটি বালা মনে করে হাতে পরেছেন, কুণ্ডলকে করেছেন আংটি। কিঙ্কিণীজালকে মালা বলে কণ্ঠে ধারণ করেছেন, হার দিয়ে সাজিয়েছেন হাত। চূড়ার সাজ চলে এসেছে পায়ে, আর পায়ের সাজ চলে গিয়েছে মাথায়। নব অনুরাগের বিপুল প্রেরণায় রাধা উদ্‌ভ্রান্ত বলেই হারিয়ে ফেলেছেন দিক-দিগন্তের জ্ঞান।

৭৮

ভালো হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু, তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ-মুখ চাই॥
আই আই পড়্যাছে মুখে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর-বিন্দু মুনি-মনোলোভা॥
খর-নখ-দশনে অঙ্গ জরজর।
ভালে সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাড়ি কোঁচার বলনি।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥
সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ উরে ভালো সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা সাজে॥
চারি পানে চাহে নাগর, আঁচলে মুখ মোছে।
চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলে না ঘোচে॥

অভিসারান্তিক মিলনেও নিরঙ্কুশ শান্তি নেই। কৃষ্ণের কোনো এক বারের অনুপস্থিতির পরের দিন সকালে রাধার সন্দিগ্ধ হৃদয়ের ব্যঙ্গোক্তিতে সেই কাঁটার দংশন। রাধার মনে হয়েছে কৃষ্ণ কারো সঙ্গে নিশাযাপন করেছেন। তিনি দেখছেন কৃষ্ণের কপালে অন্য কোনো তরুণীর সিঁদুরের দাগ, আর কারো উপভোগের নখ-দংশন চিহ্ন কৃষ্ণের সর্বাঙ্গে। কার যেন হাতের বালার দাগ কৃষ্ণের বুকে। সবচেয়ে চূড়ান্ত ভুল হয়েছে, কৃষ্ণ পরেও এসেছেন অন্য নারীর নীল বসন। বুকের উপর আলতার দাগ। বিরক্ত রাধা এবার কঠিন ব্যঙ্গের সঙ্গে বলছেন—এখন এখানে কী বাসনা নিয়ে এলে বলো।

চলইতে চাহি চরণ নাহি ধাবয়ে
রহিতে নাহিক প্রতিআশ।
আশ-নৈরাশ কছু নাহি সমুঝিয়ে
অন্তরে উপজে তরাস॥
সজনী, বচন না বোলসি আধা।
তুহুঁ রসবতী উহ রসিক শিরোমণি
হঠে রস না করহ বাধা॥
প্রেম-রতন জনু কনয়া-কলস পুন
ভাঙিলে হয়ে নিরমাণ।
মোতিম-হার বার শত টুটয়ে
গাঁথিয়ে পুন অনুপাম॥
হর-কোপানলে মদন দহন ভেল
তুয়া উরে যুগল মহেশ।
পরিহর মান কানু-মুখ হেরহ
জ্ঞান কহয়ে সবিশেষ॥

রাধার সঙ্গিনীরা রাধাকে বুঝিযে বললেন যে তোমাকে কিছু না বুঝিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে, তা পারি না, আবার থেকে যে কিছু বোঝাব সেই সাহসও হয না। তুমি এরকম হঠকারিতা কোরো না। প্রেম মতির হার নয় যে শতবার ছিঁড়লেও নতুন করে গেঁথে তোলা যাবে। এ-যেন সোনার কলস। একবার ভাঙলে আর পুনর্নির্মিত হওয়া দুষ্কর। হর-কোপানলে মদন ভস্ম হয়েছিল। তোমার বুকে যুগল শম্ভু রয়েছে, অভিমানকে ভস্ম করে ফেলতে পারছ না, দেখতে পারছ না তোমার কৃষ্ণের মুখ ?

৮০
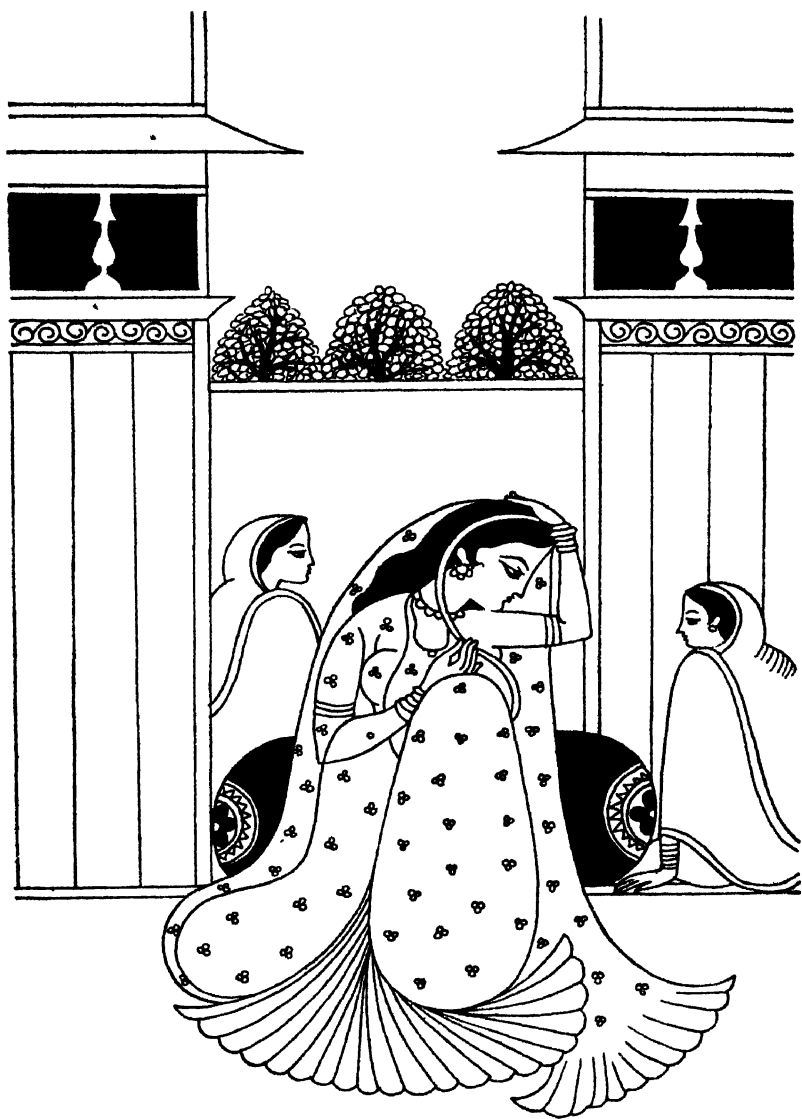
কো ইহ পুন পুন করত হুংকার।
হরি হাম জানি না কর পরচার ॥
পরিহরি সো গিরি-কন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওল মৃগরাজ ॥
সো নহ ধনি মধুসূদন হাম।
চলু কমলালয় মধুকরী ঠাম ॥
এ ধনি শুনহ হাম ঘনশ্যাম।
তনু বিনে গুণ কিয়ে কহে নিজ নাম ॥
শ্যাম মূরতি হাম তুহুঁ কি না জান।
তারাপতি ভয়ে বুঝি অনুমান ॥
ঘরহুঁ রতন দীপ উজিয়ার।
কৈছনে পৈঠব ঘন আন্ধিয়ার ॥
রাধারমণ হাম কহি পরচার ॥
রাকা রজনী নহ ঘন আন্ধিয়ার ॥
পরিচয়পদ যবে সবে ভেল আন।
তবহিঁ পরাভব মানল কান ॥
তৈখনে উপজল মনমথ সূর।
অব ঘনশ্যাম মনোরথ পূর ॥

অভিমানিনী রাধা যেন বিরাগ ভরে বসে আছেন। কৃষ্ণ এসেছেন ক্ষমা চাইতে। কৃষ্ণ পরিচয় দিলেও রাধা যেন বুঝতেই পারছেন না কে কৃষ্ণ।

রাধা ॥ কে ডাকাডাকি করছ?

কৃষ্ণ ॥ আমি হরি।

রাধা ॥ হরি, অর্থাৎ সিংহ, তা যদি হও তো গিরিকন্দর ছেড়ে এখানে আসবে কী জন্যে?

কৃষ্ণ ॥ হরি অর্থাৎ মধুসূদন। আমি মধুসূদন।

রাধা ॥ অর্থাৎ ভ্রমর। তাহলে পদ্মের কাছে গিয়ে মধুপান করো, এখানে কেন?

কৃষ্ণ ॥ তুমি বুঝছ না, আমি শ্যামমূর্তি।

রাধা ॥ তা হবে, তুমি অন্ধকার তাই চন্দ্রের ভয়ে আশ্রয়প্রার্থী, তা তুমি ঘরেই বা আসবে কী করে সেখানেও তো রত্নদীপের আলো?

কৃষ্ণ ॥ আমি রাধারমণ।

রাধা ॥ তার মানে অনুরাধা নক্ষত্রের স্বামী, চন্দ্র তুমি, কিন্তু এই অমা-রজনীতে তুমি আসবে কেমন করে?

তখন কৃষ্ণ সকল রকমে পরাভব স্বীকার করলেন। বাসনার সূর্য আত্মপ্রকাশ করল অম্লানভাবে।

৮১

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধূলি ॥
অভিমান দূরে করি চাহ একবার।
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আন্ধার ॥
রাই কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার ॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরান চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী ॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিহি নিরমিল তোহে পিরীতি-পুতলী ॥
এত ধনে ধনী যেহ সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥

আকুল মিনতি জানালেন কৃষ্ণ—তুমি বারেক মুখ তুলে তাকাও। একবার দুই হাতে তোমার চরণের ধূলি স্পর্শ করি। তোমাকে ভালবেসে আমার পীতবসন। তোমার নিশ্বাসের দমকা বাতাসে তোমার কষ্টের আশঙ্কায় আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে। আর কত ভাবে আমাকে পরীক্ষা করে দেখবে? তুমি আমার বাঁশিটিকে ধরো। তোমার চোখের তারার একটু কাঁপনে আমার হৃৎপিণ্ড দুলে ওঠে। তোমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে আমার চোখ বিভোর। রূপ-গুণের শ্রেষ্ঠ প্রতিমা তুমি। এত ধন তোমার, অথচ কৃপণ হয়ে বিমুখ হচ্ছ কেন বুঝতে পারছি না।

৮২

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনারে পরানে কেনে মার॥
যে চান্দের সুধা-দানে জগৎ জুড়াও।
সে চান্দ-বদনে কেনে আমারে পোড়াও॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ-পরশে।
সোনা শতবাণ হৈয়া কাহাকে না তোষে॥
সে চরণ-ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ॥

তোমার কাছে আকুল মিনতি জানাই একবার চেয়ে দেখো আমার পানে। তোমার যে-মুখের অমিয় বাণীতে সকলেই তুষ্ট, সেই মুখের রোষারুণ রাগে আমাকে দগ্ধ কোরো না। তোমার পায়ে ধরণীর ধূলি। উজ্জ্বলতম সোনাই তোমার পায়ে মানায়। আমি তোমার চরণধূলি স্পর্শ করতে ইচ্ছুক।

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন
বহই দিবস সব যাব।
ভালো-মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর-উপকার সে লাভ ॥
সুন্দরি হরি-বধে তুহুঁ ভেলি ভাগি।
রাতি-দিবস সোই আন নাহি ভাবই
কাল বিরহ তুয়া লাগি ॥
বিরহ-সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচ-কুম্ভ লখি দেই।
তুহুঁ ধনি গুণবতী উধার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশ লেই ॥
লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভদিন করি মান।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥

সখীদের কেউ একজন রাধাকে কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান-পীড়িত মনের যন্ত্রণা বোঝাতে গেলেন। তিনি বলছেন, তুমি তোমার যৌবন তিলার্ধকাল মাত্র রক্ষা করতে পারবে—সময় দ্রুত বয়ে গেলে সবই হারাবে। অতএব বৃথা অভিমান ত্যাগ করো। তোমার কৃষ্ণ, তোমার অভাবে বিরহ-সমুদ্রের মাঝে ডুবে যেতে বসেছেন, এখন তোমার হৃদয়-কুম্ভ তাঁর ভরসা।

৮৪

সখি হে কাহে কহসি কটু ভাষা।
ঐছন বহুগুণ এক দোষে নাশই
এক গুণ বহুদোষনাশা॥

কি করব জপতপ দান-ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নহি দীনে।
সুন্দর কুলশীল ধন-জন-যৌবন
কি করব লোচনহীনে॥

গরল সহোদর গুরুপত্নীহর
রাহু-বমন তনু কারা।
বিরহ-হুতাশন বারিজ-নাশন
একগুণ শশী উজিয়ারা॥

পরসুত-হীত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক-উচ্ছিষ্ট রস পানি।
সো সব অবগুণ সগুণ এক পিক
বোলত মধুরিম বাণী॥

কানুক পিরীতি কি কহব রে সখি
সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি করে শত শত
তবহিঁ প্রতীত নাহি বোলে॥

বর-পরিরম্ভণ চুম্বন আলিঙ্গন
সংকেত করি বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নৈরাশে॥

সুন্দর সিন্দুর   নয়নক অঞ্জন
সঞ্চরু দশ নখরেখা।
কুঙ্কুম চন্দন   অঙ্গে বিলেপন
প্রাত সময়ে দিল দেখা ॥
দশগুণ অধিক   অনলে তনু দাহিল
রতিচিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
চম্পতি পৈড়   কপূর যব না মিলব
তব মিলব হরি সঙ্গে ॥

কোনো সখী কৃষ্ণের প্রতি রাধার কটূক্তি শুনে রাধাকে বলছেন যে, তুমি কৃষ্ণের দোষ গণনাই শুধু করো, তাঁর গুণের সন্ধান করছ না। উত্তরে রাধা বলছেন, সখী তুমি অযথা মন্দ বাক্য বলছ। একটা শ্রেষ্ঠ গুণের সংস্পর্শে বহু দোষ বিনষ্ট হয়। রাহুর উচ্ছিষ্ট, গরলের সহোদর, গুরুপত্নীগামী চাঁদের সব দোষই খণ্ডিত হয়েছে একটি গুণে, সে গুণ তার উজ্জ্বলতা। কোকিল নিজের সন্তানকে দেখে না, সে কাকের উচ্ছিষ্টজীবী, তারও একটি উত্তম গুণ, সে মধুভাষী। কৃষ্ণের এমন কোনো গুণই নেই যা তাঁর দোষ খণ্ডন করবে। কৃষ্ণের অনাগমনজনিত অপরাধ, এবং অন্য নায়িকা-সম্ভাষণের ও সম্ভোগের সন্দেহে রাধা কোপান্বিতা। প্রতিজ্ঞা করছেন যে ডাবের জল এবং কর্পূর যেমন কখনো মিলিত হয় না আমিও তেমনি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হব না।

৮৫

শুনইতে কানু মুরলী রব-মাধুরী
শ্রবণ নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন-যুগ ঝাপলু
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি, তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে প্রেম বাঢ়ায়বি
জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনু গুণ পরখি পরখ রূপ-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি- ইহ রূপ-লাবণী
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস আশে।
সো অব নয়ন নীর দেই সিঞ্চহ
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥

সঙ্গিনীবৃন্দ রাধাকে বলছেন, সকলই তোমার কর্মের দোষ। আমরা তোমার কানে হাত চাপা দিয়েছিলাম, পাছে কৃষ্ণের বাঁশি তোমাকে পাগল করে। আমরা তো তোমার চোখ ঢাকা দিয়েছিলাম—যাতে কৃষ্ণরূপ তোমাকে দেখতে না হয়। তখন তুমি আমাদের উপর রাগ করেছিলে। আগু-পিছু না ভেবে ভালবাসলে সারা জীবন কেঁদেই কাটাতে হবে। গুণ পরখ না করে পরের রূপে পাগল হয়ে নিজের দেহ সঁপে দিলে। এখন রূপ-লাবণ্য সবই খোয়াতে বসেছ, জীবনই সংশয়। শ্যাম-জলধরের ন্যায় কৃষ্ণ তোমার প্রেমতরুকে জলসিঞ্চিত করবেন এই ছিল তোমার আশা। তোমার দুরন্ত অভিমানে এখন সে মেঘ গিয়েছে উড়ে—এবার শুধু নিজের নয়নবারি সিঞ্চন করে তাকে বাঁচিয়ে রাখো।

৮৬

নখ-পদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি॥
অধরহিঁ কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একই পরান॥
হামারি রোদন-অভিলাষ।
তুহুঁ কহ গদগদ ভাষ॥
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরী তুহুঁ শ্যাম-অঙ্গ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর নায়কের অসময়ে আগমনে নায়িকা ক্ষুব্ধ চিত্তে তাকে দ্বিচারণের অপরাধে অভিযুক্ত করলেন। বললেন—তোমার বুকে নখচিহ্ন দেখে আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে। তোমার মুখে কাজল দেখে আমার মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে। আমি জেগে রাত কাটালাম আর তোমার চোখ লাল হয়েছে। কেন বাজে কথা বলছ যে, তুমি আর আমি একই প্রাণস্পন্দন ধারণ করি। তোমাতে আমাতে অনেক তফাত। তুমি শ্যামাঙ্গ, আমি গৌরাঙ্গী। অতএব আর বাজে কথা বোলো না, এবার নিজ ভবনে ফিরে যাও।

৮৭

সুন্দরি কাহে কহসি কটু বাণী।
তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি ॥
তুয়া আশোয়াসে জাগি নিশি বঞ্চলুঁ
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ-বিন্দু অধরে কৈছে লাগল
তাহে ভেল মলিন বয়ান ॥
তোহে বিমুখ দেখি ঝুরয়ে যুগল আঁখি
বিদরয়ে পরান হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে মোহে উপেখবি
হাম কাঁহা যায়ব আর ॥
হামারি মরম তুহুঁ ভালো রীতে জানসি
তব কাহে কহ বিপরীত।
ঐছন বচনে দ্বিগুণ ধনি রোখয়ে
জ্ঞানদাস চিতে ভীত ॥

রাধার পূর্বোক্ত রূঢ় ভর্ৎসনার উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন—সুন্দরী, তুমি আমাকে কেন অযথা কটুবাণী বলছ। আমি তোমার চরণ ধরে শপথ করতে পারি, আমি তুমি ছাড়া আর কিছু জানি না। তোমারই আশাপথ চেয়ে সারানিশি আমি জেগে বসেছিলাম, তাই আমার চোখ রক্তিম। মৃগমদ-বিন্দু লেগে মুখ মলিন দেখাচ্ছে। এখন তোমাকে বিমুখ দেখে চোখে এসেছে জল। এ-কথা তো তুমি ভালোই জানো যে, আমার হৃদয় বলতে যা বোঝায় সে তুমিই। এখন তুমি আমাকে যদি উপেক্ষা করো তবে আমি কোথায় আশ্রয় পাব? এতে রাধা দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হলেন।

৮৮

শুন শুন মাধব নিরদয়-দেহ।
ধিক রহুঁ ঐছন তোহারি সুনেহ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সংকেত-বাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ॥
কপট নেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিকশেখর বর-কান।
তুহুঁ সম মুরুখ জগতে নাহি আন॥
মানিক তেজি কাচে অভিলাষ।
সুধা-সিন্ধু তেজি খারে পিয়াস॥
ক্ষীর-সিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ।
বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভান।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান॥

রাধা কঠিন চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে রূঢ় তিরস্কার করতে লাগলেন। ধিক তোমাকে, তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করে অপরের সঙ্গে রাত্রিবাস করেছ। তোমায় রসিকশেখর কে যে বলে জানি না। তোমার মতো মূর্খ আমি দেখিনি। তুমি মাণিক্যের বদলে কাচ কামনা করো, সুধা পরিহার করে ক্ষারে তোমার রুচি, সিন্ধুর স্থলে কূপ তোমার মনোহরণ করে। তোমার মুখ আমি দেখব না।

কয়েকদিন বাদে প্রত্যাখ্যাত কৃষ্ণের সংবাদ এল রাধার কাছে :

রামা হে কি আর বোলসি আন।

তোহারি চরণ শরণ সো হরি

অবহুঁ না মিটে মান॥

গোবর্ধন গিরি বাম করে ধরি

যে কৈল গোকুল পার।

বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ

মানয়ে গুরুয়া ভার॥

কালি দমন করল যে-জন

চরণ-যুগল বরে।

এবে সে ভুজঙ্গ ভরমে ভুলল

হৃদয়ে না ধরে হারে॥

সহজে চাতক না ছাড়য়ে ব্রত

না বৈসে নদীর তীরে।

নব জলধর বরিখন বিন্দু

না পিয়ে তাহার নীরে।

যদি দৈবদোষে অধিক পিয়াসে

পিবই চাহই থোর।

তবহুঁ তোহারি নাম সোঙরিয়া

গলে শতগুণ লোর॥

- - - - -

সঙ্গিনীরা বলছেন, হে রাধা সে তোমার চরণ শরণ করে বসে আছে আর তুমি এখনও অভিমান করে আছ। যে গিরি-গোবর্ধন ধারণ করে গোকুলবাসীদের ত্রাণ সাধন করেছিল সে এখন তোমার বিরহে এত দুর্বল যে করকঙ্কণকেও গুরুভার বলে মনে করছে। যে কালীয় দমন করেছিল সে গলার হারকে সর্পভ্রম করছে। চাতক কখনও মেঘের দেওয়া জল ছাড়া খায় না, কৃষ্ণও তেমনি তোমার প্রেম ছাড়া আর কিছু চায় না। স্বভাবতই রাধার মন এ-সংবাদে বিচলিত হল। এবং রাধা যে বিচলিত হয়েছেন সখীরা সে কথা কৃষ্ণকে জানাল।

সখীর বচনে অথির কান।
বুঝল সুন্দরী তেজল মান॥
অরুণ নয়ানে ঝরয়ে লোর।
গদগদ স্বরে বচন বোল॥
কেমনে সুন্দরী মিলব মোয়।
অনুকূল যদি বিধাতা হোয়॥
এত কহি হরি সখীর সঙ্গে।
মিলল রাইয়ে আনন্দ-রঙ্গে॥
হেরি বিধুমুখী বিমুখী ভেল।
কানুরে সো সখী ইঙ্গিত কেল।
চরণ-কমলে পড়ল কান।
সখীর বচনে তেজল মান॥
ধনি-মুখশশী হরি-চকোর।
হেরিতে দুহুঁক গলয়ে লোর॥
হৃদয়-উপরে থুওল রাই।
প্রেমদাস তব জীবন পাই॥

সখীর কথা শুনে কৃষ্ণ অস্থির হয়ে পড়লেন। বুঝতে পারলেন যে রাধার অন্তরে অভিমানের অবসান ঘটেছে। এবার বোধহয় তিনি মুখ তুলে চাইবেন। সাশ্রুনেত্রে তিনি সখীর সঙ্গে রাধার কাছে এলেন। রাধা অন্তরে অভিমান ত্যাগ করলেও মুখে তা স্বীকার করতে পারলেন না। তখন সখী ইঙ্গিত করল কৃষ্ণকে। সখীর ইঙ্গিতে রাধার চরণ ধরে কৃষ্ণ মিনতি জানালেন, মান ভাঙাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। রাধাও সঙ্গে সঙ্গে মান পরিহার করলেন—কিন্তু মুখে ভাব দেখালেন যেন নিতান্ত সখীর অনুরোধে মান ত্যাগ করেছেন। অশ্রুগলিত নয়নে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন। এবার গভীর মিলনের ভূমিকা রচনা।

বনে এমন ফুল ফুটেছে
মান করে থাকা আজ কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জ-মাঝে॥

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে

আনল রসবতী রাই।

দুখানি চরণ পাখালিয়ে সুন্দরী

আপন কেশেতে মোছাই ॥

অঙ্গক ধূলি বসনহি ঝাড়ই

অনিমিখে হেরই বয়ান।

তুহুঁ সনে মান করলুঁ বর মাধব

হাম অতি অলপ-পরান ॥

রমণীক মাঝে কহই শ্যাম-সোহাগিনী

গরবে ভরল মঝু দেহ।

হামারি গরব তুহুঁ আগে বাঢ়ায়লি

অবহুঁ টুটায়ব কেহ ॥

সব অপরাধ খেমহ বর মাধব

তুআ পায়ে সোপলুঁ পরান।

গোবিন্দদাস কহ কানু ভেল গদগদ

হেরইতে রাই-বয়ান ॥

- - - - -

কলস ভরে সুগন্ধ জল নিয়ে এলেন রাধা। কৃষ্ণের চরণ দুইখানি ধুইয়ে দিয়ে মুছিয়ে দিলেন নিজের দীর্ঘ কেশরাশি দিয়ে। অঙ্গের বসন দিয়ে তাঁর শরীরের ধূলি ঝেড়ে অনিমেষ নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, লোকে আমাকে শ্যাম-সোহাগিনী বলে সেই গর্বে আমি বিভোর। তুমিই আমার অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছ, তাই মান, তাই বিমুখতা,—সে অহংকার এখন আর কেউ ভাঙাতে পারে না। আমার সব দোষ তুমি ক্ষমা করো—আমি তোমার চরণে আমার প্রাণ সঁপে দিলাম।

প্রেম রতন জনু কনক-কলস

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে,
বনফুলের বিনোদমালা দেব গলে ॥
সিংহাসনে বসাইতে হৃদয়খানি দেব পেতে
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে ॥

৯২

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ ' কে দিল ময়ূরপুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা-মালতী মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
মনে হেন অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীলগিরি-শিখর ঘেরিয়া॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগুয়া রঞ্জিয়া।
রজতের পত্রে কেবা কালিন্দী পূজিল গো
জবাকুসুম তাহে দিয়া॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে॥

এবার মিলন। সেই রসোল্লসিত মিলনের পূর্বে আর-একবার আমরা স্মরণ করব নায়কের রূপলাবণ্য। নীল মেঘের চূড়ায় উজ্জ্বল ইন্দ্রধনুর মতো কৃষ্ণের মাথার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ। মোহন-চূড়াকে ঘিরে সাতনরী মল্লিকা-মালতীর মালা। যেন নীলগিরি থেকে নেমে এসেছে নদীধারা। শ্যামল ললাটে চন্দনের ফোঁটা, যেন নীল আকাশে চন্দ্রোদয়। চন্দনের টিপের মাঝে ফাগের বিন্দু। যেন যমুনার কালো জলে রূপার বাটিতে করে কে জবাফুল ভাসিয়ে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের কালো শরীরে কে লাল হিঙ্গুল গুলে দিয়েছে? তাতে মনে হচ্ছে যমুনা আরাধনার জন্য কে যেন তার কালো জলে ভাসিয়েছে রক্তকরবীর রাশি। এই রূপময়কে ভালবেসেছিলেন রাধা। ইনিই তাঁর আশা, আকাঙ্ক্ষা, যন্ত্রণা। এঁকে ঘিরেই তাঁর পূর্বরাগ, অভিসার, মান।

৯৩

মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ
মধুপ-শবদ গঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জর-গতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী ॥
ঘন-গঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতী-ফুল-মাল রঞ্জ
অঞ্জন-যুত কঞ্জনয়নী খঞ্জন গতিহারী ॥
কাঞ্চন-রুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী করকঙ্কণ মৃদু ঝংকৃত মনোহারী ॥
নাচত যুগ ভ্রূ-ভুজঙ্গ
কালিদমন-দমন রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীল শাড়ি ॥
দশন কুন্দ-কুসুম নিন্দু
বদন জিতল শারদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে প্রেমসিন্ধু প্যারী ॥
ললিতাধরে মিলিত হাস
দেহ-দীপতি তিমির-নাশ
নিরখিরূপ রসিকভূপ ভুলল গিরিধারী ॥
অমরাবতী-যুবতীবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্দ
মন্দ মন্দ হসনা নন্দ নন্দন-সুখকারী ॥
মণিমানিক নখে বিরাজ
কনক নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থল-জলরুহ চরণকি বলিহারি ॥

এতদিনে, সকল ঝঞ্ঝাঘন নিশীথের দুর্যোগের শেষে, সকল সংকোচ, সকল সংসার

গীতির উপসংহারে, মান-অভিমানের পালা চুকিয়ে রাধা স্বীকার করবেন তাঁর প্রেমের রাজপুত্রকে। মহারাস আর ঝুলনের সেই আনন্দোদ্বেল রসোল্লাসের চূড়ান্ত মুহূর্তের আগে সখীবেষ্টিতা রাধার রূপ আরেকবার স্মরণ করা যাক। এই পদটিতে আনন্দস্বরূপিণী রাধার যে চিত্র পাওয়া যায় তা দুর্লভ। যুক্তাক্ষরের সার্থক প্রয়োগে ক্ষণে-ক্ষণে আনন্দ সিন্ধু মনে হয় যেন রাধার শরীরে তরঙ্গায়িত। কান পাতলে যেন এখনও শুনতে পাই তাঁর করকঙ্কণের কিঙ্কিণী। চোখ বুজলে যেন দেখতে পাই কালীয়দমন কৃষ্ণকে যে ভ্রূ-যুগল পরাস্ত করেছে তার আশ্চর্য কম্পন। গৌরাঙ্গী রাধা এবং তাঁর সখীদের নীল শাড়িতে যেন উৎসবের আভাস। স্বর্ণবর্ণ অঙ্গে যেন অনঙ্গের হিল্লোল। বিন্দু বিন্দু ঘামে সুন্দর মুখখানিতে প্রেমের সিন্ধু প্রকাশ। আকাশচারিণী দেবীরাও ধাঁধায় পড়েছেন এই রূপ-সমারোহ দেখে। এই সমারোহের স্মৃতি নিয়ে আমরা এখন যাব রাস আর ঝুলনের প্রেমোৎসবে—যেখানে অবাধ নবযৌবন অম্লান আনন্দের সাগরে আত্মহারা।

কদম্বতরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী ॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিয়ে তুহুঁ লাবণী বৈদগধি ধনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥
রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে-পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোনো সখী চামর ঢুলায়।
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র-করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু কর ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক অঙ্গ ভরে ॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে রাই মুখ-ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥
কুসুমিত বৃন্দাবন কলপতরুর গণ
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনে খচিত হেম মন্দির সুন্দর যেন
নরোত্তম মনোরথ পূর ॥

ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেছে কদম্বের ডাল, যেন ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে মাটিতে। সারা অরণ্য সুরভিত। ভ্রমরের দল লীলাচঞ্চল। রাধার ডান হাতখানি

ধরে, কৃষ্ণ চলেছেন ঝুলন নৃত্যের জন্য। সঙ্গিনীরা পুষ্পবর্ষণ করছে চারিদিক থেকে। চাঁদের আলো পড়েছে বেদীর উপর। পুষ্প-পরাগে ধূসর মণিময় বেদী। রাধা আর কৃষ্ণ পরস্পরের হাত ধরে ফিরে-ফিরে নাচতে লাগলেন। নাচের তালে-তালে সখীরা ছড়াতে লাগল ফুল। নৃত্যের শ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল রাধার মুখে। আজ আনন্দের অবধি নেই। আজ যেন তারই সাদৃশ্য বহন করে—কুসুমে-কুসুমে ছেয়ে গিয়েছে এ মধু কানন দেশ।

আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান ॥

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৯৫

নাচত বৃখভানু কিশোরী
অঙ্গে-অঙ্গে বাহু জোড়ি
মেঘ উপরে যৈছে দামিনী
ফিরত ঐছন ভাতিয়া
তরু তমাল শ্যামলাল
মাঝে রহত ধরত তাল্
ভালি ভালি করত রহত
গমন মন্থর পাঁতিয়া ॥
নূপুর বলয়া কঙ্কণ সাজ
কন কন কন কিঙ্কিণী বাজ
তালে রিঝত সুগড় শেখর
ডুবল জলদ কাঁতিয়া।
বসন-ভূষণ কবরী ভার
খোলি পড়ত বার বার
হসত খসত কোই পড়ত
রঙ্গিনী রঙ্গে মাতিয়া ॥
তাল মৃদঙ্গ ডম্ফ বাজ
বীণা পাখোয়াজ মধুর গাজ
আনন্দে মগন বৃখভানু-সুতা
সব সখীগণ সঙ্গিয়া।
রসভরে উহ খীণ অঙ্গ
রাই বৈঠলি শ্যাম সঙ্গ
মন্দ মন্দ হসত রহত
কানু অঙ্গে অঙ্গিয়া ॥

এখন শুধু আনন্দের তরঙ্গে ভাসা, এখন শুধু প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রেমের

উৎসব। রাস-নৃত্যে সঙ্গিনীসহ নৃত্যরতা উল্লাসময়ী রাধাকে কবি বর্ণনা করছেন। মৃদঙ্গে, বীণায়, পাখোয়াজে উঠেছে বোল আর ঝংকার। ভঙ্গিময়ী রাধার নূপুরে, বালার কঙ্কণ-কিঙ্কিণীতে নৃত্যের রিণিঝিনি। নাচের উল্লাসে শিথিল তাঁর অঞ্চল, শিথিল তাঁর কবরী। সঙ্গিনীরা হাস্যে-লাস্যে পূর্ণ করেছে এই আনন্দঘন পরিবেশ। তমালের তলে তমালকান্তি কৃষ্ণকে ঘিরে স্বর্ণকান্তি তরুণীর দল নেচে চলেছেন। যেন মেঘের উপরে খেলা করে যাচ্ছে বিদ্যুৎলতা। নাচের শেষে ক্লান্ত রাধা কৃষ্ণের পাশে বসলেন। মুখে তাঁর মৃদু মৃদু আনন্দিত ক্লান্তির হাসি। কৃষ্ণের অঙ্গে হেলান দিয়ে বসলেন রাধা।

৯৬

ঘর হৈতে আইলাম বাঁশি শিখিবারে।
নিজ দাসী বলি বাঁশি শিখাহ আমারে॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরিলে হে চিত॥
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব-ফুল ফুটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার নাম উঠে॥
ভালো হৈল আইলে রাই মুরলী শিখাব।
জ্ঞানদাসের মনে বড়ো আনন্দ হইব॥

প্রেমের লীলাবিলাসের অন্ত নেই। রাধা অনুনয় জানাচ্ছেন কৃষ্ণকে—বাঁশি বাজানো শেখাও। কেমন করে তোমার বাঁশির সুরে যমুনা উজানে বয়, কেমন করে কদম্বের শাখা পুষ্পিত হয় তোমার বাঁশির তানে, কেমন করে রাধার প্রেমের সমুদ্রে বান ডাকাও—শেখাও।

ধরবা ধরবা ধর মোর পীতবাস পর
গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তুরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব বনমালা পরাইব
চূড়া বান্ধ আলাঞা কবরী ॥
গৌর অঙ্গুলি তোর সোনা বান্ধা বাঁশি মোর
ধরো দেখি রন্ধ্র মাঝে-মাঝে।
তিন ঠাঁই হও বাঁকা কদম্বেতে দেহ ঠেকা
তবে সে বিনোদ-বাঁশি বাজে ॥
মুরলী অধরে লেহ এই রন্ধ্রে ফুক দেহ
অঙ্গুলি লোলায়ে দিব আমি।
জ্ঞানদাস এই রটে যা বলিলা তাই বটে
ত্রিভঙ্গ হইতে পারো তুমি ॥

কৃষ্ণ তখন কৌতুকপরায়ণা নায়িকাকে বললেন—বেশ কথা, শিখিয়ে দেব কেমন করে বাঁশি বাজায়। তুমি আমার পীতবসনখানি পরো, কস্তুরী মেখে গৌর অঙ্গ কালো করে কৃষ্ণ সাজো। চূড়া বাঁধো মাথায়। ফরসা আঙুলগুলি বাঁশির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে খেলা করে যাক। ঠোঁটে তুলে নাও বাঁশি। বাজাও এবার। বাঁশির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আঙুলগুলি আমি নুইয়ে দেব।
এমনি করেই রাধা সেজেছিলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বসন বিনিময় করে সেজেছিলেন রাধা। উভয়ের ভালবাসা উভয়ের হৃদয়ের উত্তাপে এমনি করে হয়েছে গভীর। যে গভীর প্রেম উভয়ের দিক থেকেই ধীরে-ধীরে পৌছে যায় আত্মনিবেদনের শান্ত উপকূলে। রাধার কণ্ঠে তখন তারই বাণী।

নবরে নবরে নব নবঘন শ্যাম।
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম॥
তোমার পিরীতি-সুখ-সায়রের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুল-শীল-লাজ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি॥
তুমি যে আমার বন্ধু, আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার।
বাঁচি কি না বাঁচি বন্ধু, থাকি কি না থাকি।
অমূল্য ও রাঙাচরণ জীয়ন্তে যেন দেখি॥
যদুনাথ দাসে কহে করুণার সিন্ধু।
কিসের অভাব তার তুমি যার বন্ধু॥

তোমার প্রেম-সমুদ্রের মাঝে ডুব দিয়েছি। ভেসে গেছে আমার কুল-শীল-লাজ। তোমার এই বিপুল প্রেমের বিনিময়ে কী তোমাকে দিতে পারি বলো। তোমাকে যা দিতে পারি সে তোমারই দান। তোমাকে দিলেও তা আমারই থাকে। তাই আমার কোনো অন্যতর প্রার্থনা নেই—যেন তোমার রাঙাচরণ দুখানি সারা জীবন আঁখির সম্মুখে দেখি।

৯৯

বঁধু কি আর বলিব আমি।

জীবনে মরণে জনমে জনমে

প্রাণনাথ হইও তুমি ॥

তোমার চরণে আমার পরানে

বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।

সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া

নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে

আর মোর কেহ আছে।

রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই

দাঁড়াব কাহার কাছে ॥

এ-কুলে ও-কুলে দু-কুলে গোকুলে

আপনা বলিব কায়।

শীতল বলিয়া শরণ লইনু

ও দুটি কমল-পায় ॥

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে

যে হয় উচিত তোর।

ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে

গতি যে নাহিক মোর ॥

আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি

তবে সে পরানে মরি।

চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন

গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

- - - - -

এত দুঃখের পরে মিলনের নিবিড়তায় রাধার ঐকান্তিক প্রার্থনার ভাষা তাই এই—জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমাকেই যেন ভালবাসতে পারি। তোমার কাছে যেমন হৃদয়ের সাড়া পেয়েছি, ত্রিভুবনে এমনটি আর কোথাও পাইনি।

১০০

তোমার গরবে গরবিনা হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও ছুটি চরণ
সদা লয়্যা রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জন
আমার কেবল তুমি।
পরান হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥
শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড়ো আমি।
সখীগণ গণে জীবন অধিক
পরান বঁধুয়া তুমি॥
নয়ন অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাস কহে কালার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥

প্রেমের আনন্দোৎসবে, মিলনের পূর্ণতায় যে বৈভব-বোধ সঞ্চিত হল নায়ক-নায়িকার মনে, তা প্রেমকে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করল পূজায়। দেহের সীমানা ছাড়িয়ে তা এবার চলে গেল দেহাতীতের দিকে। রাধা বলছেন শ্রীকৃষ্ণকে—তুমি আমার নয়নের অঞ্জন, আমার অঙ্গের ভূষণ। আমি কেবল অনন্যমনা হয়ে তোমাকেই ভালবাসি। তুমিই আমার অহংকার, তোমার রূপের আলো হৃদয়ে জাগিয়ে আমি রূপবতী।

১০১

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।

সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে

তিলে তিলে নূতন হোয় ॥

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ

নয়ন না তিরপিত ভেল।

সোই মধুর বোল শ্রবণহিঁ শুনলুঁ

শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥

কত মধু-যামিনী রভসে গোঙায়লুঁ

না বুঝলুঁ কৈছন কেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ

তবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥

কত বিদগধ জন রসে অনুমগন

অনুভব কাহু না পেখ।

কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে

লাখে না মিলল এক ॥

- - - - -

তাই রাধা বলছেন—সখি, তুমি আমাকে আমার অনুভূতির কথাটি জিজ্ঞাসা করো? সেই ভালবাসার অনুভূতি আমি ব্যাখ্যা করি কী ভাবে, তা যে ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে আসে প্রাণে। মনে হয় যেন জন্মাবধি আমি ঐ রূপ দেখছি, কিন্তু দেখে দেখে আমার চোখের সাধ মিটল না। তার সেই সুন্দর কথা আমি কান দিয়ে শুনেছি বটে, কিন্তু আমি এতই মুগ্ধ যে, তার কোনো কথার অর্থই আমার হৃদয়গোচর হয়নি। কত ফাল্গুনের রাত তারই সঙ্গে সানন্দ প্রেমের লীলায় কেটে গেল—কিন্তু কে যে কী আচরণ করেছি তার কিছুই বুঝিনি—এখন আর তা স্মরণে নেই। যেন মনে হয় লক্ষ-লক্ষ যুগ তার বক্ষে বক্ষ রেখেছি তবু তো হৃদয় শীতল হল না, কত রসিকজন পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু প্রেমের সবটুকু অনুভব করতে পেরেছেন এমন তো কাউকে দেখলাম না।

চিরকাল চোখে চোখে
নূতন-নূতনালোকে
পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।
বুঝা যায় আধো প্রেম, আধখানা মন—
সমস্ত কে বুঝেছে কখন ?

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০২

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।

দেহমন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল-শীল-জাতি মান॥

অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।

গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥

পিরীতি রসেতে ঢালি তনুমন
দিয়াছি তোমার পায়।

তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়॥

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালো-মন্দ নাহি জানি।

কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণখানি॥

তাই বলি তুমিই আমার ঈশ্বর। তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়েছি। আমাকে লোকে কলঙ্কিনী বলে অপবাদ দেয়। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এ-কলঙ্কই আমার মণিহার, কেননা তোমারই দেওয়া এ-কলঙ্ক। একে কণ্ঠে ধারণ করতে সুখ বই দুখ নেই। শুধু তোমার চরণ দুখানিই আমার সম্বল। ভালো-মন্দ, সতীত্ব-অসতীত্ব এসব কিছুই আমি জানি না। "রাই কলঙ্কিনী ডুবিয়া মরেছে কৃষ্ণ কলঙ্কেরই সাগরে।"

মনে হয় যেন এরই প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ বলছেন :

১০৩

জপিতে তোমার নাম বংশী ধরি অনুপাম
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরী আইলুঁ গোকুলপুরী
বরজ মণ্ডলে পরকাশ ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাহিয়া করিতে নারি শেষ ॥
গঞ্জন-বচন তোর শুনি সুখের নাহি ওর
সুধাসম লাগয়ে মরমে।
তরল কমল-আঁখি তেরছ নয়নে দেখি
বিকাইলুঁ জনমে জনমে ॥
তোমা বিনু যেবা যত পিরীতি করিলুঁ কত
সে পিরীতে না পূরল আশ।
তোমার পিরীতি বিনু স্বতন্ত্র না হইল তনু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস ॥

তোমারই নাম-গান করব বলে আমার বাঁশিতে তুলি স্বর। আমার পীত বস্ত্রের প্রীতি শুধু তোমার দেহবর্ণের স্মৃতিকে জড়িয়ে রাখার জন্য। আমার জীবন যেন তোমারই প্রেমসাধনা। প্রিয়তমে, আমি যুগ-যুগান্ত গান করেও তোমার মহিমার অন্ত পাই না। তোমার তিরস্কারেও আমার তৃপ্তি। তোমার তরল কটাক্ষের কাছে আমি আমার জন্ম-জন্ম বিকিয়ে বসে আছি।

১০৪

সই পিরীতি আখর তিন।

জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত॥
পিরীতি মন্তর জপে যেই জন
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতে আপনা বেচিলুঁ
নিছি দিলুঁ জাতি কুল॥
সে রূপ-সায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল যে চিতে
নিবারিব কিবা দিয়া॥
খাইতে খাইছি শুইতে শুইছি
আছিতে আছয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দি ঘর-দ্বারে॥

রাধা বলছেন, তার রূপসাগরে আমার নয়ন ডুবেছে, তার গুণে বন্দী হয়েছে আমার মন। আমার ভালবাসার স্বরূপ আমার প্রেমের মূর্ত রূপ সকল রসের সার। জন্মাবধি সেই প্রেমের মন্ত্র জপ করে করেও তার অন্ত পেলাম না। সেই প্রেমের পদমূলে উৎসর্গ করেছি আমার জাতি কুল লাজ ভয়। এ-সংসারে থাকতে হয় তাই থাকা, নইলে বন্ধুর প্রেমের নির্দেশে আমি এ-সংসারে অগ্নি-সংযোগ করতে পারি।

১০৫

লোচন শ্যামর বচনহি শ্যামর
শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয়-মণি শ্যামর
শ্যামর সখী করু কোর ॥
মাধব ইথে জনি বোলবি আন।
অচপল কুলবতী মতি উমতায়লি
কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান ॥
মরমহি শ্যামর পরিজন পামর
ঝামর মুখ-অরবিন্দ।
ঝরঝর লোরহি লোলিত কাজর
বিগলিত লোচন-নিন্দ ॥
মনমথ সাগর রজনী উজাগর
নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাস কতহুঁ আশোয়াসব
মিলবহি নন্দকিশোর ॥

কেননা কৃষ্ণকে ভালবেসে তাঁর চোখে কালো কাজল। তাঁর মুখে শ্যামনাম। তাঁর বসনে তাঁর প্রেমিকের রঙ। নীল হার তাঁর গলায়। নীলমণি তাঁর বক্ষে। দিবারাত্র সেই প্রেমিকের কথা ভেবে-ভেবে তাঁর ফুলের মতো সুন্দর মুখ মলিন। সেই ভালবাসার কথা ভেবে-ভেবে চোখের জলে ভেসে গেছে তাঁর কাজল। ঘুম ঘুচে গেছে তাঁর দু-চোখে। কবি বলছেন, আমি আর কত আশ্বাস দেব তাঁকে যে আসবে, আসবে, সে আসবে।

১০৬

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই কে বলে পিরীতি হীরা।
সোনায় মুড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিলা ফিরা॥
পরশ-পাথর বড়োই শীতল
কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী লাগিল আগুনি
পাইলুঁ এতেক শোকে॥
সব কুলবতী করয়ে পিরীতি
এমত না হয় কারে।
এ পাড়া-পড়শী ডাকিনী-সদৃশী
সকলে দোষয়ে মোরে॥
গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরানে সহিব কত॥
নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইব কোথা॥

অথচ কৃষ্ণকে যে ভালবাসি তাতে চন্দনের মতো যতই ঘর্ষণের বেদনা ততই সৌরভের শুদ্ধতা। প্রেমের হীরাকে সোনায় জড়িয়ে বক্ষে ধারণ করতে গিয়েই দেখলাম—একে পরতে গেলে বাধে, একে ছিঁড়তে গেলে বাজে।

১০৭

ছাড়িয়া ঘরের আশ		করিব সে বনবাস
এই চিতে দঢ়াইলুঁ সার।
রাতি দিবসে হাম		হিয়ার উপরে থোব
না করিব আর আঁখির আড় ॥
সই তোমারেই কহিয়ে মরম।
জাতি মোর ভাসাইলুঁ		কুলে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
ঘুচাইলুঁ ধরম করম ॥
শাশুড়ি ননদী ডরে		নিশ্বাস না ছাড়ি ঘরে
এই দুখে হেন সাধ করে।
অঙ্গের উপর অঙ্গ থুইয়া		চান্দমুখ নিরখিয়া
মনের কথাটি কব তারে ॥
নয়ান না দেখে আন		আন নাহি শুনে কান
যত দেখি সব লাগে ধন্দ ॥
বলরাম দাসে বলে		না জানি কি করিলে
সে নাগর গোকুলের-চন্দ ॥

সেই সুখকে খুঁজতে গিয়েই রাধা শেষে প্রতিজ্ঞা করছেন যে, সংসারের আশা ত্যাগ করে বনবাস করব। দিবারাত্র তাকে নিজের বুকের উপরে রেখে দেব, চোখের আড়াল আর করব না। সমস্ত জাতি-কুল-মান, ধর্মাধর্ম বিসর্জন দেওয়ার পরেও তুচ্ছ সংসার ভয়ে মিলনে এত বাধা এ আর সহ্য হয় না। ইচ্ছা করে—কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে, হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব। ইচ্ছা করে কেবল তাকেই মনের কথা বলি। শুধু সেই একমাত্র সরল, বাকি সবই যেন ধাঁধার মতো জটিল। ওদের কথায় ধাঁধা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি।

১০৮

নিতুই নৌতুন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি থায়॥
সখি হে অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এতদিন চাই অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম॥
উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
একি অপরূপ তাহার স্বরূপ
স্বভাবে করিল অন্ধ॥
চণ্ডীদাস কহে দোহ সম হয়ে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন্ জনে
শুনি না দরবে চিত।

তিল তিল করে এই প্রেম বেড়ে চলেছে। দুখানি হৃদয়ে আর তিল ধারণের অবকাশ নেই, তথাপি এ-প্রেমের নদীতে ভাঁটা পড়ে না। সকল উপমা ব্যর্থ হয়ে যায় এই প্রেমের সম্মুখে। ত্রিভুবনে এমন কেউ নেই যার হৃদয় এই প্রেমের কাহিনী শুনে দ্রবীভূত না হবে।

১০৯

তোমাতে আমাতে যেমত পিরীতি
ভালে সে জানহ তুমি।
লোক-চরচাতে ভাসুর ভাওই
এমতি থাকিব আমি॥
আসিবা যাইবা দূরেতে থাকিবা
না চাবে আমার পানে।
বড়োই বিষম গুরু দুরুজন
দেখিলে মরয়ে প্রাণে॥
তুমি যদি বলো পরান-বন্ধু তবে
কুলে বা আমার কি।
ইঙ্গিত পাইলে সব সমাধিয়া
কুলে তিলাঞ্জলি দি॥
সে দুখ চাহিতে এ দুখ বড়োই
কহি কেহ নাহি দেশী।
গোপত পিরীতি রাখিতে যুগতি
কহে রসময়ী দাসী॥

এ-প্রেমের পথে সামাজিক প্রতিকূলতা আছে বলেই এই গোপন প্রেমের সংকেত। রাধা বলছেন, প্রকাশ্য জীবনে, হে প্রিয়তম, তোমাতে আমাতে দুস্তর ব্যবধান বিদ্যমান এমন ভান করতে হবে। ভান করতে হবে যেন উভয়ের মধ্যে ভাশুর-ভাদ্রবধূর মতো মুখদর্শনও নেই। এই সংসারের জন্যই আমাকে এমন করতে হয়। হে হৃদয়-বন্ধু, তুমি যদি বলো তা হলে সংসারের মুখ তাকিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার ক্ষণিক ইঙ্গিতেই আমি সকল কিছু বিসর্জন দিতে পারি।

রাধার এত সব প্রেম-তন্ময় কথার জবাবে কৃষ্ণ বলছেন :

১১০

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।

তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি॥

থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াথ নাহিক পাই।

গগনে-ভুবনে দশ দিগগণে
তোমারে দেখিতে পাই॥

তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।

খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে॥

শুন বিনোদিনী প্রেমের কাহিনী
পরান রৈয়াছে বান্ধা॥

একই পরান দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥

এত কথা তুমি আমাকে কী বলছ শ্রীমতী? তুমি কি মনে করো তোমার এই বিভোর দশা সে শুধু একাকিনী তোমারই? অশান্ত, অস্থির মন নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই। তোমারই ছায়া দেখতে পাই পৃথিবীর সর্বত্র। গিরি নদী অরণ্যে তোমারই দেখা পাব বলে আমার ঘুরে বেড়ানো। আমার হৃদয়-পটে তোমার প্রেমোজ্জ্বল মূর্তি চির অম্লান। হে আনন্দ-স্বরূপিণী, একটা কথা কি জানো? তোমার আমার হৃদয় এক—কেবল দেহ দুটিই ভিন্ন।

১১১

ননদিনী লো মিছাই লোকের কথা।
যদি কানু সঙ্গে পিরীতি করি তো
শপতি তোমার মাথা॥
নিজ পতি বিনে আন নাহি জানি
সেই সে আমার ভালো।
কোন্ গুণে যাই রাখালে ভজিব
তাহাতে বরণ কালো॥
মণি-মুকুতার আভরণ নাহি
সাজনি বনের ফুলে।
চূড়ার উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
তাহে কি রমণী ভুলে॥
রাজা হৈয়া যারে দেখিতে না পারে
মায়ে বলে ননীচোরা।
কহে শিবরাম রাধার কলঙ্ক
মিছাই করিলি তোরা॥

পরিবার-পরিজনদের কাছে রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রেমের বিষয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন। বলছেন—তোমাদের মাথার দিব্য দিয়ে বলছি তার সঙ্গে আমার কোনো প্রেমই নেই। আমি এই সংসার ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আর তাছাড়া কৃষ্ণ তো রাখাল, তার উপর তার বর্ণ কালো, মণি-মুকুতাহীন বনকুসুমের মালায় সজ্জিত সেই রাখাল—যাকে রাজা কংস দেখতে পারে না, যাকে মায়ে বলে ননীচোরা, তাকে আমি কেন ভালবাসতে যাব? তোমরা মিছামিছি আমার কলঙ্ক রটাও।

পিরীতি বিষম বেথা

কাঁদালে তুমি মোরে
ভালবাসারই ঘায়ে

১১২
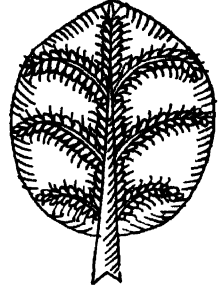
তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি।
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি-কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
নীরস দরপণ সুদূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥
ছি ছি কি শরদের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া সখী ছানিয়ে বিজুরী।
অমিয়ার সাঁচে যদি রচিয়ে পুতলী॥
রসের সায়র মাঝে করাই সিনান।
তবু তো না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির॥

প্রেম মানেই যন্ত্রণা। যারা সুখের লাগি প্রেম চাহে, তাদের প্রেম মেলে না, ওদিকে সুখ চলে যায়। আর এ-যন্ত্রণার মূল সুরই হল—মধুর তোমার শেষ যে না পাই, অথচ প্রহর হল শেষ। 'যাহাকে পেয়েছি তাকে কখন হারাই।' তাই রাধা-কৃষ্ণের গভীর প্রেমের আকাশে বিরহের ম্লান ছায়া চিরকালই ছলছল করে। কৃষ্ণ বলছেন—কী দিয়ে তুমি বিরচিত, রাধা, সে কথা আমি জানি না, কিন্তু এ জানি যে তুমিই আমার সেই রত্ন। কোটি কল্পকাল যদি দিবারাত্র অপলক নয়নে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকি—তবু

আমার দু-চোখের পিপাসা মিটবে না। চাঁদে কিংবা পদ্মে তোমার সম্যক তুলনা নেই। আকাশের বিদ্যুৎকে ছেঁকে, অমৃতের ছাঁচে পুতুল গড়িয়ে রসের সায়রে যদি স্নান করানো হয় তাহলেও, সে দিব্য সৌন্দর্যও তোমার কাছে তুচ্ছ। তাই এ-হেন সম্পদকে হৃদয়ের মাঝে স্থাপন করেও আমার তৃপ্তি নেই। মনে হয় এই বুঝি হারিয়ে ফেলি।

কিন্তু রাধার যন্ত্রণার কি তাতে উপশম হয়?

১১৩

পিরীতি সুখের দেখিয়া সায়ের
নাহিতে নাম্বিলুঁ তায়।
নাহিয়া উঠিতে ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায় ॥
কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল ॥
গুরুজন জ্বালা জলের শিহালা
পড়শী জীয়ল মাছে।
কুল-পানিফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইলুঁ যদি।
অন্তরে বাহিরে কুটুকুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি ॥
চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখ লাভ তরে পিরীতি যে করে
দুখ যায় তার ঠাঁই ॥

নারী বলেই সমাজ-সংসারের সকল আঘাত তিনিই সহ্য করেছেন। সুখের বাসনা বুকে নিয়ে যে সংসার-অনভিজ্ঞা তরুণী প্রেমের সায়রে অবগাহনের জন্য নেমেছিলেন, এখন দেখছেন যে সেই সায়রে দুঃখের জলজন্তু সদাই ঘুরে বেড়ায়, প্রাণ সংশয়। সেই জলে শেওলার মতো গুরুজনের জ্বালা। পড়শীরা জিয়ল মাছের মতো কাঁটার আঘাত করে। কুলাচারের পানিফলের কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। সে জল ছেঁকে পান করেও রেহাই নেই। অন্তরে বাহিরে তার জ্বালা।

১১৪

ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই।
জনম হৈতে একা কৈলে দোসর দিলে নাই ॥
না দিলি রসিক মূঢ় মুরুখের সনে।
এমতি আছিল তোর এ পাপ বিধানে ॥
যার লাগি প্রাণ কান্দে তার নাই দেখা।
এ পাপ করমে মোর এই ছিল লেখা ॥
ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে কবি চণ্ডীদাসে ॥

অথচ তাই বলে প্রেমকে পরিহার করাও সম্ভব নয়। কৃষ্ণের দেখা না পেলে একাকিত্বের যে প্রচণ্ড যন্ত্রণা তাও যে সহ্যাতীত। স্রষ্টা এবং বিধাতার বিধানে রাধার ভস্মমুষ্টি নিক্ষেপ করতে সাধ যায়। যার জন্য 'অন্তরে ক্রন্দন করে হৃদি মন্থন' তার দেখা নেই। এই পাপকর্মের ফলেই এই দুঃসহ নৈঃসঙ্গ্য। ইচ্ছা করে সারা সংসারে আগুন দিয়ে দূরদেশে চলে যাই।
এমতাবস্থায় যখন আবেগ-পূরিত চিত্তে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ঘটে তখন সাশ্রুনেত্রে রাধা বলেন :

তোমার লাগিয়া বন্ধু যত দুখ পাই।
তাহা কি কহিতে আমি পারি তব ঠাঞি ॥
একে প্রেম-জ্বালা তাহে গুরুর গঞ্জন।
নিরবধি প্রাণ মোর করে উচাটন ॥
পতি দুরমতি তাহে সদা দেয় গালি।
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ অতি কালি ॥
এসব দুখেতে আমি দুখ নাহি গণি।
তোমা না দেখিতে পাই বিদরে পরানি ॥
শুনিয়া নাগর কহে করি নিজ কোরে।
বুক ভাসিয়া গেল নয়ানের লোরে ॥
গদগদ কহে নাগর কাতর বয়ানে।
পরান নিছিলুঁ রাই তোমার চরণে ॥
তুয়া গুণে বিকাইয়াছি কিনিয়াছ মোরে।
অধীন জনেরে কেন কহ পুনবারে ॥
যে কহ তাহাই করি নাহি কিছু ভয়।
যদু কহে এই ভালো, আর কিছু নয় ॥

হে বন্ধু, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না যে শুধু তোমার জন্য কত দুঃখ। একদিকে তোমার প্রেমের যন্ত্রণা, আর-একদিকে সমস্ত সংসারের গঞ্জনা। উদ্বেগে দিনে দিনে ক্ষীণ হচ্ছে আমার তনুলতা। কিন্তু তুমি জানো না, এসব দুঃখকে আমি দুঃখ বলে গণনা করি না। দুঃখ শুধু এই যে তোমাকে দেখতে না পেলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এ-কথা শুনে কৃষ্ণ রাধাকে আলিঙ্গন করে বললেন—তুমি তো জানো আমি তোমার চরণে আমার প্রাণ নিবেদন করেছি। তুমি যা বলো আমি তাই করব। অতএব কেন ভয় করছ।

১১৬

সখী হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।

জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে

তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥

নয়ান পুতলী করি লইলুঁ মোহনরূপ

হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।

পিরীতি আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি

জাতি-কুল-শীল অভিমান ॥

না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে

না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।

স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি

কি করিবে কুলের কুকুরে ॥

খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে

বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।

মুরারী গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে

তার গুণ তিন লোকে গায় ॥

যারা রাধাকে সমাজ-বুদ্ধি যোগাতে এসেছিল রাধা সরাসরি তাদের প্রত্যাখ্যান করলেন। যে জীবন্ত অবস্থায় নিজেকে হত্যা করতে চায় সে তোমাদের সুবুদ্ধির ভরসা রাখে না। প্রেমের অগ্নিকুণ্ড যখন থেকে জ্বালিয়েছি তখন থেকে সেই আগুনেই সমর্পণ করেছি জাতি-কুল-শীল-অভিমান—সর্বস্ব। কে মূঢ় আমাকে কি বলছে, কে কি বিচার করছে আমি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনি না। প্রেমের তীব্র-স্রোত নদীতে আমি ভেসেছি, এখন কুলবুদ্ধির কুকুরের সহস্র চিৎকারেও আমার কিছু আসবে যাবে না। আমি সেই বন্ধুকেই জানি, আর কিছুকে নয়, আর কাউকে নয়।

১১৭

শুনিয়া দেখিলুঁ   দেখিয়া ভুলিলুঁ
ভুলিয়া পিরীতি কৈলুঁ ।
পিরীতি বিচ্ছেদে   না রহে পরান
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ ॥
সই পিরীতি দোসর ধাতা ।
বিধির বিধান   সব করে আন
না শুনে ধরম কথা ॥
পিরীতি মিরীতি   তুলে তৌলাইলুঁ
পিরীতি গুরুয়া ভার ।
পিরীতি বেয়াধি   যার উপজয়ে
সে বুঝে না বুঝে আর ॥
সভাই কহয়ে   পিরীতি কাহিনী
কে বলে পিরীতি ভালো ।
কানুর পিরীতি   ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥
জীবনে মরণে   পিরীতি বেয়াধি
হইল যাহার সঙ্গ ।
জ্ঞানদাস কহে   কানুর পিরীতি
নিতি নৌতুন রঙ্গ ॥

- - - - -

এখানেই সেই সকল সংসার-বুদ্ধি-বিনাশী, সকল স্বার্থ-বিপর্যয়ী ঘোষণা রাধার কণ্ঠে বিপুল দৃঢ়তায় উচ্চারিত হল—প্রেমই দ্বিতীয় বিধাতা। কেননা প্রেমই এ-পৃথিবীতে বিধি-বিধানকে উল্‌টিয়ে দিতে পারে। সে কোনো লৌকিক ধর্মের মুখ তাকিয়ে চলে না। আমি প্রেম ও মৃত্যুকে একই তৌলে ওজন করে দেখেছি প্রেমের গুরুত্বই অধিক। সেই গুরুভার প্রেমকে বহন করতে গিয়ে আমার বুকের পাঁজর ধসে গেল। এ-এক আশ্চর্য ব্যাধি। একমাত্র ব্যাধিগ্রস্ত ছাড়া আর কেউই এ-কথা বোঝে না।

১১৮

না বোল না বোল সখী না বোল এমনে।
পরান বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥
তেজিল কুল-শীল এ লোক-লাজ।
কি গুরু-গৌরব গৃহের কাজ॥
তেজিয়া সব লেহা পিরীতি কৈলুঁ।
যে ইহায় বিরতি তারে জিয়ন্তে মেলুঁ॥
যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়॥
ঠেকিলুঁ প্রেমফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে জ্ঞানদাস না করে আশ॥

- - - - -

আমি যে সেই প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে প্রাণকে বেঁধেছি—আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ। গুরুগৌরব, গৃহকর্ম, কুল-শীল সকল কিছুই আমি ছেড়েছি। সার করেছি তোমার প্রেম। নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন আর সংযত হয় না তেমন এ-চিত্ত আর সংযত করে না।

১১৯

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিলুঁ
জ্বালাতে জ্বলিল দে।
স্বাদু নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি হেন রসবতী
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল॥
পিরীতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাঢ়ালুঁ তাতে।
তবু সে সজনী দিবস রজনী
অনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ॥
চণ্ডীদাস কয় হিয়ায় সহয়
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষগুণ আধা
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল॥

সুখ চেয়ে ভালবাসলাম। তা বয়ে নিয়ে এল গভীর দুঃখ। রসাস্বাদনের মানসে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে গিয়ে দেখি লবণাধিক্যে সে ব্যঞ্জনে শুধু শরীর জ্বালা করে। প্রেম-সমুদ্রে আমার অনুরক্তি যত বাড়ল, ততই দেখি সেই সমুদ্র জন্ম দিল বাড়বানলের। সেই অনলে আমার হৃদয় এখন বহ্নিমান। নিম আর সুধা একত্র করে এই প্রেম। কিন্তু আমার বেলায় যেন সকলই বিষ হয়ে গেল।

১২০

একে কাল হৈল মোর নহলি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥
আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোরে যমুনার জল ॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোরে গিরি গোবর্ধন ॥
এত কাল সঙ্গে আমি বঞ্চি একাকিনী।
এমন জনেক নাই শুনয়ে কাহিনী ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে না কহ এমন।
কারু কোনো দোষ নাই সবে একজন ॥

রাধা বলছেন যে, আমার এই দুর্দশার কারণ বহু। এই নবযৌবন, এই বৃন্দাবনে বাস, কদম্বের তলে বাঁশি শোনা, যমুনার জলে স্নান, আমার এই রতনে-ভূষণে সজ্জিত রূপ, এই গিরিগোবর্ধনের সান্নিধ্য—এই সমস্তই আমার প্রেম-সমুদ্রে ডুবে মরার মূলে। একাকিনী নিজের দুঃখের ভার বয়ে বেড়াই, সমব্যথী কেউ নেই যে তাকে মনের কথা বলি, কিন্তু রাধা বোধহয় একটু ভুল করছেন—এতগুলি বিষয় রাধার দুর্দশার মূলে নয়। মূলে শুধু সেই একজন।

১২১

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় অন্য জন
ইহা কি পরানে সয়॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন-বাড়ি যায়
আমারি আঙিনা দিয়া॥
যেদিন দেখিব আপন নয়ানে
আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি পেলি বেশ দূর করি
ভাঙিব আপন মাথা॥
বন্ধুর হিয়া এমন করিলে
না জানি সে-জন কে।
আমার পরান যেমন করিছে
এমনি হউক সে॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরী
মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥

- - - - -

যে প্রেম তার গভীর অনুভূতির আবেগে সদাই কম্পমান—কখন হারাই, কখন হারাই, সে প্রেম প্রেমাস্পদের উপর পূর্ণ অধিকারকে বিন্দুমাত্র শিথিল করতে চাইবে না, এ স্বাভাবিক। রাধা বলছেন—আমি যার জন্য সমস্ত অপযশকে অঙ্গের ভূষণ বলে মেনে নিলাম তাকে আর কেউ অধিকার করবে এ অসহ্য। যাকে ভালবাসি সে যদি অন্যের কাছে যায়, তবে আমার অভিশাপ এই যে সেই নারীর হৃদয় যেন আমারই মতো যন্ত্রণায় জ্বলে।—আমার পরান যেমনি করিছে তেমনি হউক সে।

১২২

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখী কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিলুঁ
রবির কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িলুঁ অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল
মানিক হারালুঁ হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ-অধিক শেল॥

ক্রমশই রাধার মনে প্রেমের যন্ত্রণার রৌদ্ররাগ দীপ্ত হয়ে উঠছে। প্রেমেও তৃপ্তি নেই, ওদিকে সংসারের দেওয়া কলঙ্কের পাত্র কানায়-কানায় ভরে উঠল। এখন মনে হচ্ছে যাকে অমৃত-সিন্ধু ভেবে স্নান করতে নেমেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে গরলসিন্ধু। রাধা ভাবছেন—এ সবই আমার কর্মফল। অঙ্গ জুড়াবে বলে চন্দ্রকিরণের সন্ধান করেছিলেন—বিনিময়ে পেয়েছেন কঠিন সূর্য-দাহ। সংসারের নিচু জমি ছেড়ে উৎরাইয়ের সন্ধান পরিসমাপ্ত হল অগাধ জলরাশিতে। আমি লক্ষ্মী চেয়েছিলাম, পেলাম দৈন্য। আমি পিপাসার্ত হয়ে মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করেছিলাম—সেই মেঘ নিষ্ঠুর বজ্রাঘাতে আমার প্রার্থনাকে চূর্ণ করেছে। এই প্রেম আমার মৃত্যুশেল।
তাই সম্ভবত রাধার মনে উঁকি দেয় মৃত্যুকামনা। তিনি বলেন :

১২৩

কী মোহিনী জানো বঁধু, কী মোহিনী জানো।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি ॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি ॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয় ॥

তোমার ভালবাসার মোহন মন্ত্রে তুমি আমার প্রাণ হরণ করতে চাও? রাত্রির অন্ধকারকে অন্ধকার বলে মানিনি, দিবসের সংসার মনে হয়েছে রাত্রির মতো বিজন—তবু তোমার ভালবাসার ধারা-ধরন আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। যারা আমার আপনার তারা হয়ে গেল আমার পর, আর যে পর তাকে টেনে নিলাম বক্ষে। স্রোতের মুখে শৈবালের মতো আমি ভেসে গেলাম। এমন সমব্যথী কেউ নেই যে রাধা বলে আমাকে ডাকে। হে বন্ধু, তাই বলি তুমি যদি আমাকে দয়া না করো, তবে ক্ষণেক দাঁড়াও, আমি তোমারই সম্মুখে জীবন বিসর্জন দেব।

এ পূর্বরাগ পাবে না ক্লান্তি—দিন তো রাত্রি, রাত্রি করেছি দিন ॥

(বিষ্ণু দে)

১২৪

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিচয়ে মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই ॥
শাশুড়ি-ননদীর কথা সহিতেও পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি ॥
চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া-পড়শীর ডরে ॥
তাহে আর তুমি সে হইলা নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন ॥

- - - - -

যত দিন যাচ্ছে তত বুঝতে পারছেন এ প্রেম কত দুর্বহ। প্রাণ খুলে চোখের জল ফেলে শীতল হবেন এমন স্থানও সংসারে নেই। সংসারের নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে বলছেন, সে-সবই সহ্য হয়, সহ্য হয় না তোমার নিষ্ঠুরতা। চোরের স্ত্রী যেমন ডাক ছেড়ে কাঁদতেও পারে না—এমনই অবস্থা হয়েছে আমার। অশ্রুভারে ক্লান্ত স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান কালো হয়ে ওঠে অথচ কাঁদলে অপযশ ঘোষিত হবে।

১২৫

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়ে ধারা ঢাকি যদি গায়।
আন ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ি।
কালো হার কাড়ি লয় কালো পাটের শাড়ি॥
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদমুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলাজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরীতি॥

কাঁদলে ওরা ভাবে তোমার কথা ভেবেই কাঁদছি। যদি আঁচলে মুছে ফেলি চোখের জল তবে সিক্ত অঞ্চল তারা গুরুজনদের দেখায়। কালো এই শব্দ উচ্চারণ করার উপায় নেই। কালো শাড়ি, কালো হার ওরা সবাই কেড়ে নেয়। আর তুমিও একবার দেখা দিয়ে যাও না। বুঝতে পারি না যে শুধু দেখা দিয়ে যেতে তোমার কী ক্ষতি হয়। নির্লজ্জ প্রাণও হয়েছে তেমনি—দেহ ছেড়ে চলেও যায় না।

১২৬

বঁধু কি আর বলিব তোরে।

অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে ॥

কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।

মরিয়া হইব শ্রীনন্দ-নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥

পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।

ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে ॥

মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা
সহজে কুলের বালা।

চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥

ভালবাসার যে যন্ত্রণা চিরকাল নারীকেই বহন করতে হয়, সেই প্রবল যন্ত্রণার আক্ষেপে রাধা এবারে উচ্চারণ করছেন শাস্তির বাণী। আমার প্রথম যৌবনে আমাকে ভালবেসে তুমি ঘরছাড়া করলে—কিন্তু ভালবাসার সুখ পেলাম কই। এইবারে সাগরের জলে জীবন সমর্পণ করব। এই অন্তিম কামনা নিয়ে মরব যে, পরজন্মে আমি হব কৃষ্ণ, তুমি হবে রাধা। আমিই তখন বাঁশির সুরে-সুরে তোমার যমুনায় যাবার পথে সৃজন করব প্রেমের মোহিনী মায়া। তখন সেই যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলতে-জ্বলতে, হে নিষ্ঠুর, তুমি বুঝবে প্রেমের তীব্র দহন কত অসহ্য।

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
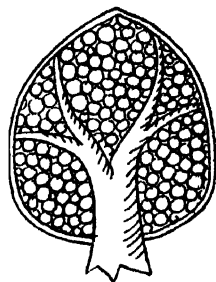
তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি···

১২৭

নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি যা সম
সো আওল ব্রজ মাঝ।
ঘরে-ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ॥
সজনী রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহু বনমালী॥
যোগিনী-চরণ শরণ করি সাধহ
বান্ধহ যামিনী-নাথে।
নখতর চান্দ বেকত রহু অম্বরে
যৈছে নহত পরভাতে॥
কালিন্দী দেবী সেবি তাহে ভাখহ
সো রাখউ নিজ তাতে।
কীয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাতে॥

- - - - -

গোটা জীবন প্রেমের থেকে অনেক বড়ো। তাই ব্রজভূমির প্রেমের অভিজ্ঞতার মাঝখানেই আচম্বিতে মথুরার আহ্বান বেজে ওঠে। অক্রূর এসেছেন—হে কৃষ্ণ, এবার চলো, কংস-নিধনের জন্য, মথুরার সিংহাসন থেকে শিষ্ট-পালন আর দুষ্ট-দমনের জন্য। এ আহ্বানে কৃষ্ণ যে সাড়া দিয়েছিলেন তাতে তাঁর সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বই ঘোষিত হয়। কিন্তু তাতে রাধার সান্ত্বনা কোথায়? যে কৃষ্ণের প্রেমের গৌরব করে সংসারের সব অপযশ, সব কলঙ্ক মাথায় করে নিল সে চমকিত হল এই সংবাদে। সেদিন অক্রূরের আগমন সংবাদ ব্রজভূমিতে ঘরে-ঘরে রটে গেছে। কাল সূর্যোদয়ে চলে যাবেন কৃষ্ণ। রাধা আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করছেন—যেন আজ রাত্রি প্রভাত না হয়। যোগিনীর উপাসনা করে তোমরা সবাই চাঁদকে আকাশে বেঁধে রাখো। আকাশ ভরে জেগে থাক নক্ষত্র আর চাঁদ। যমুনার পূজা করে তাকে বোঝাও যেন তার পিতাকে সে ধরে রাখে—যেন সূর্যোদয় না হয়।

১২৮

কোথা যাহ পরান রাধার।
মুখ তুলি চাহ একবার ॥
কি কহিলা কুঞ্জ-কুটিরে।
দুটি হাত দিয়া মোর শিরে ॥
দাঁড়াইতে নাহি গাছতলা ॥
সায়রে ভাসাইলা ব্রজবালা ॥
তোহারি সোহাগে মজি গেলুঁ।
গুরু গরবিত না মানিলুঁ ॥
উভ হাতে শঙ্কর বোলে।
রথ রাখো যমুনার কূলে ॥

স্বভাবতই ঐ অসম্ভব প্রার্থনায় আকাশচারী নিষ্ঠুর দেবতারা কেউই সাড়া দিলেন না। অক্রুরের সারথ্যে কৃষ্ণ ত্যাগ করলেন ব্রজভূমি—বৃহত্তর জীবনের আকর্ষণে। কবি নিজেই যেন এখানে দু-বাহু তুলে মিনতি করছেন—রথ রাখো যমুনার কূলে। দ্রুতগতি রথে কৃষ্ণ চলে যাচ্ছেন। বিচ্ছেদের অনিবার্যতায় তিনিও আর রাধার দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন না। রাধা বলছেন—আমাকে ফেলে, আমার সমস্ত প্রাণ-মন নিয়ে তুমি কোথা যাচ্ছ? কুঞ্জ-কুটিরে আমার মাথায় হাত দিয়ে তুমি কী শপথ করেছিলে মনে নেই? তরুতলহীন নিরাশ্রয় আমি, কোন্ সমুদ্রে আমাকে ভাসিয়ে গেলে? আমি যে তোমারই জন্য গুরুগৌরব কিছু মানিনি!

১২৯

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মানিক কো হরি নেল ॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী ॥
কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটির ॥
সহচরী সঞে যাঁহা কয়ল ফুল-খেরি।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি ॥
বিদ্যাপতি কহে করো অবধান।
কৌতুকে ছাপি তঁহি রহু কান ॥

তারপরে কৃষ্ণ চলে গেলেন মথুরায়। সারা ব্রজপুরে নেমে এল কান্নার রোল। রাধা ভাবেন—এ-জনপদ যেন শূন্য হয়ে গেল, শূন্য হয়ে গেল আমার ভবন। শূন্য হল চারিদিক, শূন্য হল সকলই। আর আমি কেমন করে যমুনা-তীরে যাব, কেমন করে চেয়ে দেখব সেই শূন্য কুঞ্জ-কুটির। যেখানে সহচরীদের সঙ্গে ফুলখেলা করতাম, কেমন করে প্রাণ ধরে তার দিকে তাকাব? বৃথা সান্ত্বনা দিচ্ছেন কবি যে, তিনি যাননি, কোথাও লুকিয়ে রয়েছেন।

১৩০

যে মোর অঙ্গের পবন-পরশে
অমিয়া-সায়রে ভাসে।
এক আধ তিলে মোরে না দেখিলে
যুগ-শত হেন বাসে॥
সই সে কেনে এমন হৈল।
কঠিন গান্ধিনী তনয় কি গুণে
তারে উদাসীন কৈল॥
পরানে পরানে বান্ধা যেই জনে
তাহারে করিয়া ভীন।
মথুরা নগরে থুইলে কার ঘরে
সোঙরি জীবন ক্ষীণ॥
কেমনে গোঙাব এ দিন রজনী
তাহার দরশ বিনে।
বিরহ-দহনে যে দেহ মলিন
আন্ধল হইনু দিনে॥
অন্তর বাহির মলিন শরীর
জীবনে নাহিক আশ।
শুনি বেয়াকুল হইয়া ধাইয়া
চলিল শঙ্কর দাস॥

তারপর শুধু অখণ্ড বিরহ। রাধা প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে ভাবতে বসলেন—এ কেমন করে সম্ভব? যে আমার দেহের সৌরভ পেলে সুধাসমুদ্রের স্পর্শ পায়, যে একতিল না দেখলে ভাবে শত যুগের বিরহ ভোগ করছে—সে মথুরায় আমাকে ছেড়ে আছে কেমন করে? কী করে সম্ভব হল এ-ঔদাসীন্য? কিন্তু সে না হয় পারে, আমি কেমন করে পারব? খরসূর্যালোকও যে আমার কাছে আঁধার হতে বসেছে।

"ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াষা কেমনে আছে সে পাসরি।"

১৩১

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ-লব ভৈ গেল নৈরাশা॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই॥
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু-পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ॥
পাপ পরান আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝূর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর॥

হায়, আমার প্রেমের অঙ্কুর মুঞ্জরিত হবার আগেই দারুণ রৌদ্রে সবই শুকিয়ে গেল। প্রতিপদের চাঁদ উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে গেল। নিষ্ঠুর নায়ক এমন করে আমাকে ভুলে থাকবে? যেন বিধাতার সৃষ্টিই পাল্টিয়ে যেতে বসেছে, প্রেমিক আমার আমাকেই বঞ্চনা করল। চাঁদ হয়ে সে চকোরীকে বিমুখ করল কী করে, ফুল হয়ে মৌমাছিকে? আমার পাপ পরান এখন আর কিছু মানবে না শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ করেই কাঁদবে।

১৩২

সজনী কে কহ আওব মাধাই।

বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব

মঝু মনে নহি পতিয়াই ॥

এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ

দিবস দিবস করি মাসা।

মাস মাস করি বরিখ গোঙাইলুঁ

ছোড়লুঁ জীবনক আশা ॥

বরিখ বরিখ করি সময় গোঙাইলুঁ

খোয়লুঁ এ তনু আশে।

হিম-কর কিরণে নলিনী যদি জারব

কি করব মাধবী মাসে ॥

অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব

কি করব বারিদ মেহে।

ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব

কি করব সে পিয়া-নেহে ॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতী

অব নহি হোত নিরাশ।

সো ব্রজনন্দন হৃদয়-আনন্দন

ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ ॥

- - - - -

এমন করেই দিন কাটে। কৃষ্ণ ফিরে আসবেন এ-প্রত্যাশাও ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যায়। এখন-তখন করে দিন চলে যায়, দিন গণনা করতে-করতে বয়ে যায় মাস, মাস গণনা করতে গিয়ে বৎসরও চলে যায়। কবে আসবে তুমি? যদি দারুণ শীতের আঘাতে পদ্মের পাপড়ি ঝরিয়ে ফেলি কী হবে আর ফাল্গুনের বসন্ত-স্পর্শে? যদি অঙ্কুরেই শুকিয়ে মরে যাই কী হবে বারি-গর্ভ মেঘের দানে?

সে কাল আসব বলে চলে গেছে

আমি যে সেই কালের আশায় বসে আছি।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৩৩

চীর চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদীগিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা
বড়ো দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজব ঝাঝর ভেলা॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারী॥

যার সঙ্গে ব্যবধান সৃজিত হলে মিলনের পরিপূর্ণতা থেকে বঞ্চিত হব এই ভয়ে বুকের উপর বসন রাখিনি, হার খুলে ফেলেছি—এমন কি চন্দনের প্রলেপও মুছে ফেলেছি—আজ সে নদী পাহাড়ের ব্যবধানে চলে গেল। যার গর্বে আমি অন্য সবাইকে তুচ্ছ করেছি, এখন সে চলে গেছে বলে আমাকে কে কি না বলছে। তার কোনো দোষ নেই। পূর্বজন্মে বিধাতাই ভ্রমবশত এই অদৃষ্টভারে আমাকে পীড়িত করেছেন। সে নেই। এখন আমার সমস্ত হৃদয় ছিদ্রময়।

১৩৪

সহজে হুনিক পুতলি গোরী।
জারল বিরহ-আনলে তোরি॥
বরণ কাঞ্চন এ দশবাণ।
শ্যামরি সোঙরি তোহারি নাম॥
শুনহ মাধব কহলুঁ তোয়।
সমতি না দেই সতত রোয়॥
অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোল।
সুমেরু উপরে চামর ডোল॥
গলায় এ গজমোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥
অঙ্গুল-অঙ্গুরি বলয়া ভেল।
জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল॥

রাধার সখীদের কেউ একজন মথুরায় কৃষ্ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত। তারা জানাল রাধার দুঃসহ বিরহ-বেদনার কথা। ননীর পুতুল সেই গৌরাঙ্গী তরুণী তোমার বিরহ-অনলে জ্বলে যাচ্ছে। আগুনে পোড়ানো সোনার মতো বর্ণ এখন বিমলিন। তার কান্নার আর ক্ষান্তি নেই। শিথিল কবরী বুকের উপর লুটিয়ে রয়েছে। তার রক্তিম অধর পাণ্ডাস হয়েছে। সে এত ক্ষীণ হয়েছে যে বসনও হয়েছে গুরুভার। আঙুলের আংটি হয়েছে যেন হাতের বালা।

যদি মনে নাহি রাখে, সুখে যদি থাকে, তোরা একবার দেখে আয়—
এই নয়নের তৃষা, পরানের আশা, চরণের তলে রেখে আয়।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৩৫

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে॥

হায়, যদি এই নবযৌবন বিরহে বিফল হবে, তবে আর তার ভালবাসায় আমার লাভ কি? অঙ্কুর যদি পুড়েই গেল প্রখর সূর্য-কিরণে, তবে জলভরা মেঘ কী উপকারে আসবে? এ সবই দুর্দৈব। সিন্ধু ছিল সম্মুখে, কিন্তু সে আমার পিপাসা ঘোচাল না, চন্দন দিল না সুরভিত ছায়া, চাঁদ বর্ষণ করল অগ্নিতাপ। চিন্তামণি ছেড়ে দিল নিজের গুণ। শ্রাবণ আকাশ দিল না এক ফোঁটা জল। কল্পতরু হয়ে গেল বন্ধ্যা। যে সকল ব্রজবাসীকে ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছিল, দিয়েছিল আশ্রয়, সে আমাকে আশ্রয় দিতে পারল না, এ-এক অমোচনীয় রহস্য।

১৩৬

রসের হাটেতে আইলাম সাজায়্যা পসার
গাহক না আয়ল যৌবন ভেল ভার ॥
বড়ো দুখ পাই সখি বড়ো দুখ পাই।
শ্যাম-অনুরাগে নিশি জাগিয়া পোহাই ॥
বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায়।
হিম-ঋতু-পবনে মোর হিয়া চমকায় ॥
দারুণ কোকিল মোর প্রাণ নিতে চায়।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায় ॥
ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায়।
কানুরাম দাসের তনু ধূলায় লোটায় ॥

রাধা বলছেন, আনন্দের হাটে যৌবনের পসরা সাজিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, সেই রসগ্রাহী এল না। বৃথা কেটে যাচ্ছে যৌবন। কৃষ্ণ-বিরহে দুঃখের রাত্রি জেগে পোহাচ্ছি। এখন সারা পৃথিবীর নিসর্গ-শোভা আমার কাছে বিষবৎ। চাঁদের আলোয় হয়তো মনে জাগে কত স্মৃতি, কোকিলের ডাকে ভেসে আসে কত মধু-যামিনীর কথা।

ভোখে ভাত না খায় পিয়া তিরিষায় পানি।
রাতি দিবস মোর দেখে মুখখানি ॥
আঁখির নিমিখে পিয়া হারায় হেন বাসে।
হেন পিয়া কেমনে আছয়ে দূর দেশে ॥
প্রাণ করে ছটফট নাহিক সম্বিৎ।
কি করিয়া পাসরিব পিয়ার পিরীত ॥
মরিব মরিব সই কি আর যতনে।
সে পিয়া পাসরে যদি কি ছার জীবনে ॥
কত পরিহার কৈল ধরিয়া আঁচলে।
হাস বিলাস কত করে নানা ছলে ॥
তবু তারে না চাহিলাম নয়ানের কোণে।
সোঙরি এ দুখে প্রাণ কান্দে রাতি দিনে ॥
হাস হাস নয়ান জুড়াকু চাঁদমুখী।
এ বোল বলিতে পিয়া ছলছল আঁখি ॥
বলরাম দাস পহুঁর সোঙরিতে লেহ।
পরান ফাঁফর হৈল খীণ হৈল দেহ ॥

যে ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহার করে শুধু আমার মুখের উপর চোখ-দুটিকে রেখে দিন আর রাত কাটিয়েছে, চোখের পলক ফেললে আমাকে হারিয়ে ফেলবে এই ছিল যার ভয়—সে কেমন করে আমাকে ছেড়ে প্রবাসে রয়েছে। একদিন যে আমার আঁচল ধরে কত মিনতি করেছে, কত হাসি ছিল যার আমাকে ঘিরে, কত বিলাস—তবু গরবিনীর মতো যার দিকে কটাক্ষেও তাকালাম না এখন তার কথা স্মরণ করতে গিয়ে অশ্রুপাত করি। একদিন যে এই বলে প্রার্থনা করেছে—হে প্রিয়তমে, হাসো একবার, আমার হৃদয় জুড়াও, এখন সে কতদূর।

১৩৮

মথুরার নাম শুনি পরান কেমন করে।
বড়ো মনে সাধ লাগে কানু দেখিবারে ॥
আর কি গোকুল-চান্দ না করিব কোলে।
পাইয়া পরশমণি হারাইলুঁ হেলে ॥
ও পারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখি হৈয়া উড়ি যাঙ পাখা না দেয় বিধি ॥
আগুনেতে দিয়ে ঝাঁপ আগুন নিভায়।
পাষাণেতে দিয়ে কোল পাষাণ মিলায় ॥
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে সিঁচি না টুটে পাথার ॥
তরু-তলে যাঙ যদি সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মুঞি মরোঁ সে হৈল নিদয়া ॥
কত দূরে প্রাণনাথ আছে কোন্ দেশ।
চম্পতি—পতি বিনু তনু ভেল শেষ ॥

একবার চোখের দেখা যদি দেখতে পেতাম—নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণায় বারে বারে সেই কথাই রাধার মনে জাগে। যে রতনমণি আমি পেয়ে হারালাম সে কোথায় কোন্ ব্যবধানের পারে থাকে। যদি পাখা থাকত, পাখি হয়ে উড়ে যেতাম। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মনের আগুন নিভাতে চাই, মনের পাষাণ ভার মিলিয়ে দিতে চাই পাষাণকে আলিঙ্গন করে। ইচ্ছা হয় যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, সাঁতার জানি না। তাই কলসে কলসে জল ছেঁচে ফেলতে চাই কিন্তু তাতে করে কি পাথার নিঃশেষিত হয়? অঙ্গ জুড়াতে চেয়ে গাছতলায় যেতে চাইলে, অভাগীকে সেও ছায়া দেয় না। হে প্রিয়তম, তুমি কোথায়, কতদূরে?

১৩৯

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥
রোপিনু মল্লিকা নিজ করে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে ॥
নিকুঞ্জে রাখিলুঁ মোর এই গলার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥
এই তরু-শাখায় রহিল সারী-শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে ॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সর্ব বাণী ॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা ॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি ॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥
শুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর।
কি কহিব শেখর বচন না ফূর ॥

সখি, তাকে বোলো যে একবার সে যেন কখনো সময় করে এই ব্রজপুরে আসে। আমি হয়তো তখন থাকব না, রইল আমার নবমল্লিকার চারা, তার ফুলের মালা সে যেন একবার গলায় পরে। আমার গলার মালা নিকুঞ্জে রেখে গেলাম, সে যেন কণ্ঠে ধারণ করে। কী দশা আমার হয়েছিল এই শুকসারী রইল, তারা তাকে বলবে। লীলাচঞ্চল হরিণী জানাবে সব কথা। আমি থাকব না— কিন্তু ভাগ্যবান শ্রীদাম রইল, এদের সঙ্গে তার দেখা হবে। শোকাহত মাতা যশোমতী উত্থানশক্তিরহিত, সে যেন একবার তাকে দেখা দিয়ে যায়। শুধু আমি থাকব না। দেখা হবে না শুধু আমার সঙ্গে।

১৪০

সখি হামারি দুখের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।

কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥

কুলিশ কত শত পাত-মোদিত
মউর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।

ভনয়ে শেখর কৈছে নিরবহ
হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥

দিন চলে যেতে-যেতে আবারও এসেছে বর্ষা ঋতু। সেই অভিসারের বর্ষা ঋতুর অঝোর ধারা, যা তখন প্রিয়তমকে পাবেন বলে বর্ষা বলেই মনে করেননি রাধা। এখন এ বর্ষা শুধু অসীম শূন্যতার নিদর্শন। শূন্য মন্দির আমার। প্রিয়তম রইল প্রবাসে, অথচ বাসনাও দুর্মর। বজ্রপাতে মনে জাগে অভিসারের স্মৃতি। দাদুরির ডাকে, ময়ূরের নাচে মিলন রজনীর কথা, ঝুলন-সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। নীরন্ধ্র তিমিরে ঢেকেছে চারিধার। অস্থির বিদ্যুতের চমক যেন জলেরই মতো চমকে-চমকে উঠছে। কেমন করে তাকে ছেড়ে আমার দীর্ঘ রজনী কাটবে।

১৪১

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল।
কহিও বন্ধুরে মোর এত পরিহার ॥
এক তিল যাহা বিনু যুগ শত মানি।
তাহে কি এতহুঁ দিন সহয়ে পরানি ॥
যদি না আইসে বন্ধু নিশ্চয় জানিও।
মরিব আনলে পুড়ি তাহারে কহিও ॥
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি ॥
এ ছার জীবন আর ধরিতে নারিব।
এবার না আইলে পিয়া নিশ্চয় মরিব ॥
শুনিয়া রাধার এত বিরহ-হুতাশ।
চলিলা ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস ॥

যাও তোমরা সব। কৃষ্ণকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো যে আজ-কাল করে আর কত দিন অপেক্ষা করব? এক তিল যে বিরহ সহ্য হত না, এতদিন ধরে তা কি প্রাণে সহ্য হয়? বোলো আর আমার দিন গোনার শক্তি নেই, আর আমার জেগে রাত পোহাবার শক্তি নেই। সে যদি না আসে তা হলে আমায় মৃত্যুই বরণ করতে হবে।

১৪২

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল॥
ভেল পরভাত কালি কহে সবহিঁ
কহ কহ রে সখি কালি কবহিঁ॥
কালি কালি করি তেজলুঁ আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
পুর-রমণীগণ রাখল বারি॥

দেওয়ালের গায়ে এক দুই করে দাগ দিতে দিতে সারা দেওয়ালই তো ভরে গেল, আর সেই যে কাল আসব বলে সে চলে গেল—সে কাল কবে আসবে? কাল কাল এই শুনতে-শুনতে আমার আশারই মৃত্যু ঘটেছে।

কত শারদ যামিনী হইবে বিফল, বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন, আশার স্বপন প্রভাতে যাইবে ছলিয়া॥

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৪৩

বাহুড়িয়া আইস বন্ধু পরান-পুতলি।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ করিছে বিকুলি॥
কত আঁখি পসারিব মথুরার পথে।
পাপিয়া পরান নাহি গেল তোমার সাথে॥
হেদে হে গোকুল-প্রাণ জীবন-ধন শ্যাম।
এক বেরি দরশন দিয়া রাখো প্রাণ॥
জনম অবধি দুখ আছে হিয়া ভরি।
দেখিলে তোমার মুখ সকলি পাসরি॥
একবার বাহুড়িয়া আইস ব্রজপুরে।
নিরখি তোমার মুখ দুখ যাউক দূরে॥
শীতল মন্দির মাঝে তোমা বসাইব।
যত মনের দুখের কথা সকল কহিব॥
কতদিনে পূরিবে হিয়ার অভিলাষ।
শ্যাম নিয়ড়ে চলু রসময় দাস॥

তুমি একবার ফিরে এসো। হে বন্ধু, হে আমার হৃদয়-পুত্তলী, তোমাকে না দেখে আমি বিফল। মথুরার পথে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বসে আছি, ভাবছি কেন তোমার সঙ্গেই আমার পাপ প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে গেল না। জন্মাবধি শুধু দুঃখই ভোগ করলাম। তুমি একবার ফিরে এসো। তোমার মুখ দেখে আমার সকল দুঃখ জুড়াক। যত মনের কথা তোমাকে বলে হালকা হই।

১৪৪

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখ-ভার ॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি ॥
কত দিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেওব হাত ॥
কত দিনে করে ধরি বৈসায়ব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারী।
ভাগউ সকল দুখ মিলত মুরারী ॥

এ-দুর্বহ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা কবে ঘুচবে? কতদিনে শেষ হবে এই হাহাকারের। কতদিনে কুমুদের সঙ্গে চাঁদের মিলন হবে। কতদিনে ভ্রমরের সঙ্গে কমলের হবে লীলাবিলাস। কতদিনে সে আসবে? কতদিনে সে বুকে রাখবে হাত। কবে সে আমাকে আলিঙ্গন করবে—পূর্ণ হবে আমার মনোরথ।

১৪৫

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষৎ হঁসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম যতন পহুঁ করবে॥
রভস মাগব পিয়া যবহি।
মুখ মোড়ি বিহসি বোলব নহি তবহি॥
কাঁচুয়া ধরব যব হটিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সহজহি সুপুরুখ-ভ্রমরা।
চীর ধরি পিয়ব অধর-রস হামরা॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে॥

এই সমস্ত দিবাস্বপ্ন থেকেই জন্মাল বোধ হয় ভাবলোকের কল্প-মিলন। রাধা কল্পনা করছেন যদি সে আসে আমি কথাটি কইব না তার সঙ্গে। ঈষৎ হেসে মুখ ফিরিয়ে চলে যাব। আদর করে সে আমার আঁচল ধরলে আমি আঁচল ছাড়িয়ে চলে যেতে চাইব। সে যখন সোহাগ জানাতে চাইবে মুখ আড়াল করে আমি বলব—না। সে যখন কাঁচুলিতে হাত দিতে চাইবে আমি হাত ধরে তাকে বারণ করব—চোখের ভাষায় তাকে নিষেধ করব। কিন্তু সে এ সবই উপেক্ষা করে যখন আমাকে চুম্বন করবে, তখন, তখন আর কি আমার চেতনা থাকবে?

১৪৬

দেখিলা যতেক দুখ কহিও বন্ধুরে।
পুছিও তাহারে মোরে মনে নাকি করে ॥
কহিবা দুখের কথা বিরলে পাইয়া।
ধরিবা চরণে তার সময় বুঝিয়া ॥
কহিও কহিও সখি মোর পিয়া পাশ।
এতদিনে গেল মোর জীবনের আশ ॥
এত শুনি সো সখী করল পয়ান
আওল মধুপুরি বলরাম গান ॥

তার কাছে যাও। তাকে আমার দুঃখের কথা বলো। জিজ্ঞাসা করো তাকে, আমার কথা তার মনে পড়ে কি না। তাকে একটু একলা পেলে আমার কথা বোলো, সুযোগ পেলে তার পায়ে ধোরো, বোলো তার বিহনে আমি জীবনের আশা ছেড়েছি।

১৪৭

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব সভাবহি বিছুরল
আপনি গুণ লুবধাই ॥
মাধব অপরূপ তোহারি সুনেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জরজর
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি
ছলছল লোচন পানি।
অনুখন রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বাণী ॥
রাধা সঞে যব পুন তহিঁ মাধব
মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহু নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥
দুহু দিশে দারু দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট-পরান।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥

- - - - -

সঙ্গিনীদের কেউ একজন গিয়ে কৃষ্ণকে জানাল—তোমারই কথা ভেবে-ভেবে রাধার অঙ্গকান্তি হয়েছে তোমারই মতো। তোমার গুণের কথা চর্চা করতে গিয়ে সে নিজের স্বভাব বিস্মৃত হয়েছে। তোমার ভালবাসার কথা ভাবতে-ভাবতে এখন তার জীবন সংশয়। এ-কথা শুনে কৃষ্ণের দু-চোখে নেমে আসতে চাইল অশ্রুধারা। এ অনিবার্য প্রেমের কিছুতেই বিনাশ নেই, আবার বিরহের যন্ত্রণারও ক্ষান্তি নেই। এ যেন দু-দিকে আগুন ধরেছে—মাঝখানে কীট-পতঙ্গের মতো প্রাণ—কোনো দিকেই তার মুক্তি নেই।

১৪৮

কে মোরে মিলাঞা দিবে সো চাঁদ-বয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরান॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি॥
ধন জন যৌবন দোসর বন্ধুজন।
পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥
আজু যদি না দেখিলাম সো চান্দ-বয়ান।
নিশ্চয় জানিহ সখি তেজিব পরান॥
কেহ তো না বোলে রে আওব তোর পিয়া
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥
কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
দুখ জানাইতে চলু বলরাম দাস।

কে তাকে এনে দেবে, কে তৃপ্ত করবে আমাকে? তাকে ছেড়ে আমার ধন-জন বন্ধু-সঙ্গিনী সকলের সঙ্গই বিস্বাদ। আমার ত্রিভুবন শূন্য হয়ে গেছে তার বিহনে। কত আর নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে রাখি—আর তো কেউ আমাকে সান্ত্বনা দেয় না, বলে না যে সে আসবে।

১৪৯

হরি গেও মধুপুর হাম কুল-বালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনী।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়া-সঙ্গ দুখ হাম পাশ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক কুদিন দিবস দুই-চারি॥

রাধা বলেন, কৃষ্ণ চলে যাওয়ার পরে আমার অবস্থা যেন পরিত্যক্ত মালতীর মালা। তোমরা কি বলছ, কি জিজ্ঞাসা করছ, আর বলে দাও শুধু যে কেমন করে আমি এই দীর্ঘ দিন-যামিনী পার হব। সুখ চলে গেল তারই সঙ্গে, গেল চোখের নিদ্রা, গেল মুখের হাসি। কবি আশ্বাস দিয়ে বলছেন—হে সুন্দরী, সজ্জনের দুঃখ দুই-চারি দিনের বেশি স্থায়ী হয় না।

১৫০

যাহাঁ পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত ॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর-শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরী।
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি ॥

- - - - -

এই রকম ভাবতে-ভাবতে রাধা বুঝলেন যে ইহজন্মে বাস্তবে সাক্ষাৎ আর হবে না। বুঝলেন যে এবার মৃত্যুই ভবিতব্য। কিন্তু কল্পনাচারী প্রেম মৃত্যুর পরের কথাও চিন্তা করে। রাধা ভাবছেন যে মৃত্যুর পরে তাঁর দেহ আর থাকবে না সত্য, কিন্তু নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়ে ভালবাসবে সেই প্রিয়তমকে। আমি ধূলি হয়ে মিশে থাকব পথে, তার পদস্পর্শের আশায়। যে সরোবরে সে স্নান করবে, জলকণা হয়ে সেখানে আমি বিরাজ করব, তাকে ছোঁব বলে। সে যে দর্পণে মুখ দেখবে, আমি সেই দর্পণের জ্যোতি হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকব। সে যে পাখা দোলাবে বাতাস পাবে বলে, আমি সেখানে মৃদু বাতাস হয়ে দেখা দেব। মৃত্যুর পরই বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে মিলনের পথ এত খোলা।

আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা প্রভাতে চরণে পরিব—
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল দেখে তারে আমি মরিব ॥

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব

সে কি স্বপ্নে রূপ দেবে প্রতীক্ষায় ?

১৫১

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া-কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদী বনাওব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
দিশি দিশি আনব কামিনী ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুই এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

গভীর বিরহেই মাঝে-মাঝে বিরহের বেলা কাটানোর জন্য আকাশ-কুসুম চয়নের প্রয়োজন হয়। রাধাও ভাবছেন যে একদিন হয়তো সে আসবে। যেদিন আসবে সেদিন আমার দেহ হবে তার পূজার মন্দির। আমার স্তনযুগল হবে কনকনির্মিত মঙ্গল কলস। আমার কাজল আঁখি হবে তার দর্পণ। চিকুরে দোলাব চামর, দেহ হবে তার বেদী। আমার সুন্দর উরুদেশ হবে যুগল কদলীর মাঙ্গল্য। কটির কিঙ্কিণী হবে আম্র-পল্লবের দোলানি। আর তার চারিদিকে বসাব চাঁদের হাট।

১৫২

শুন শুন হে পরান-পিয়া।

চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি

আর না দিব ছাড়িয়া॥

তোমায় আমায় একই পরান

ভালে সে জানিয়ে আমি।

হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া

কি রূপে আছিলা তুমি॥

যে ছিল আমার করমের দুখ

সকল করিলুঁ ভোগ।

আর না করিব আঁখির আড়

রহিব একই যোগ॥

খাইতে শুইতে তিলেক পলকে

আর না যাইব ঘর।

কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে

আর কি কাহাকে ডর॥

এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া

পড়িল শ্যামের কোরে।

জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর

ভাসিল নয়ান-লোরে॥

এমন করে ভাবতে-ভাবতে রাধার কল্পনায় পুনর্মিলনের প্রতীতি দৃঢ় হয়ে ওঠে। যে বিরহ কোনোদিন ঘোচেনি, যে মিলন কোনোদিন ঘটেনি, ভাবলোকে সেই মিলনের রক্তরাগ যেন অন্তরাগের আলোয় মায়া-প্রভাত সৃজনের মতোই করুণ। রাধা বলছেন—আর তোমাকে আমি চোখের আড়াল করব না। আমার যা কর্মভোগ তা তো হলই—কিন্তু এবার আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না। কলঙ্কিনী বলবে লোকে—তা তো যা বলবার বলেছে, কাজেই আর কাকে ভয়, কিসের ভয়।

১৫৩

বাম ভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে
হৃদয়ে উঠিছে সুখ।
প্রভাতে স্বপন প্রতীত বচন
দেখিব পিয়ার মুখ॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে
ত্বজনায় একই কথা।
বন্ধু আসিবার নাম শোধাইতে
নাগিনী নাচায় মাথা॥
ভ্রমর কোকিল শবদ করয়ে
শুনিতে সাধয়ে চিত।
রুরু মৃগগণে করয়ে মিলনে
যৈছন পূরব নীত॥
খঞ্জন আসিয়া কমলে বৈসয়ে
সারী-শুক করে গান।
বংশী কহয়ে এ সব লক্ষণ
কভু না হইবে আন॥

প্রতিদিনই মনে হয় সে আসবে। এ-এক বিচিত্র কিন্তু অসম্ভব আশায় রাধার মন ভরে ওঠে। হয়তো এই আশাটুকু নিয়েই তিনি পেরিয়ে যেতে চান বিরহ-বারিধি। আজ সকাল থেকে চারিদিকে যেন তারই আগমনের ইঙ্গিত। 'তার বাম আঁখি ফুরে থরথর, তার হিয়া ত্বরুত্বরু ত্বলিছে,' আজ ভোর-রাত্রের স্বপ্নে বলেছে—তার মুখ আজ দেখতে পাবে। আজ হাত থেকে বাসন পড়ছে, ত্বজনের কথা এক হচ্ছে। নাগিনীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে আজ কি বন্ধু আসবে, সে মাথা ত্বলিয়ে সায় দিচ্ছে। আজ ভ্রমরের গুনগুন, কোকিলের কুহুকুহু শুনতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে যেন সারা বিশ্বে আজ মিলনের ইঙ্গিত। রুরু মৃগের দল আজ মিলিত হচ্ছে। খঞ্জন এসে বসছে কমলে। সারী-শুক আজ মিলনের গান করছে। এ-সব লক্ষণ ব্যর্থ হবে না।

১৫৪

আজু পরভাতে কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম শোধাইতে
উড়িয়া বৈঠল তায়॥

সখি হে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব মন্দির আওব
কপালি কহিয়া গেল॥

সুচারু বদন দেখিলুঁ স্বপন
গিরির উপরে শশী।
মালতীর মালা দধির ডালা
নিকটে মিলিল আসি॥

গণক আনিয়া পুন গণাইলুঁ
সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে যতেক গণিল
সুখের নাহিক ওরে॥

মোর একাদশ গৃহে বৈসে পাঁচ
সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।
ভৃগু-ভানু-সুত শিখি সে দ্বিতীয়ে
বৈসয়ে দেখি বিচারু॥

দেয়াসিনী আনি দেব আরাধিলুঁ
পড়িল মাথায় ফুল।
বন্ধুর নামে আগ তোলাইলুঁ
কোলে মিলাওল কূল॥

কুল-পুরোহিত আশিস করিল
সুপতি মিলিবে পাশে।
তোর দুরদিন সব দূর গেল
কহই সে জ্ঞানদাসে॥

আজ সকাল থেকেই সব সুলক্ষণের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। মনে হয় সে আসবে। সে আসবে। কলমল করে ডাকছে কাক, সে কি আসবে—এ-কথা জিজ্ঞাসা করলে উড়ে-উড়ে বসছে। আজ আমার দুর্দিনের অবসান হতে চলেছে। কাল রাত্রে আমি সুস্বপন দেখেছি। আজ গণক বলে গেছে—এবার তোমার সুসময়। জ্যোতিষ-লক্ষণেও তারই সংকেত। দেয়াসিনী আমার জন্য দেবতা আরাধনা করল। দেবতার মাথার ফুল প্রসাদী হয়ে মাটিতে পড়েছে। তাই বন্ধুর জন্য দেব-পূজায় মানত করেছি। এবার আমার দুর্দিনের শেষ।

১৫৫

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

এই রকমই কোনো এক তীব্র কল্পনার আলোকে রাধার মনে হল সত্যই যেন কৃষ্ণ এসে উপস্থিত হয়েছেন। দুঃখের রাত্রির ঘটেছে অবসান। বহু ভাগ্যে আজ রাত পোহাল। আজ তোমার মুখ দেখতে পেলাম। আজ গৃহ গৃহ বলে মেনে নিলাম, দেহ হল আমার দেহ। আজ ধন্য হল আমার জীবন, ধন্য হল যৌবন, সফল আমার অস্তিত্ব। আজ বিধাতা আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন—শেষ হয়েছে এতদিনের সব সংশয়ের। যে নিসর্গ জগৎকে কৃষ্ণ বিহনে অসহ্য মনে হচ্ছিল আজ যেন তা আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এখন কোকিল যত পারে ডাকুক। চাঁদ লক্ষগুণ উজ্জ্বল হয়ে উদিত হোক। আজ আমার প্রিয় মিলন—আজ আমি ধন্য।

১৫৬

আইস আইস বন্ধু আধ আঁচরে আসি বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়ে আঁখি ॥
বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরান
সেইখানে লঞা থোব ॥
কালো কেশের মাঝে তোমারে রাখিব
পূরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহারে প্রবোধিব
পরিয়াছি কালো পাটের জাদ ॥
নহেত লেহের নিগড় করিয়া
বান্ধিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ ॥

এসো, হে প্রিয়তম, আমার অর্ধেক আঁচলে তুমি বসো। তোমাকে দু-চোখ ভরে দেখি। অনেক দিনের পরে তোমাকে পেলাম, মনোবাসনা সফল হল। বন্ধু, তোমাকে আর ছেড়ে দেব না। তোমাকে হৃদয়ের মাঝখানে যেখানে প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে সেখানে তোমাকে রেখে দেব। আমার কালো চুলের মাঝখানে তোমাকে রাখব। গুরুজনেরা জিজ্ঞাসা করলে বলব, কালো পাটের খোঁপা পরেছি। না হলে স্নেহ দিয়ে রচনা করব শৃঙ্খল, বেঁধে রাখব তোমার চরণপদ্ম। দেখব তখন কে সিঁধ কাটতে পারে আমার বুকের পাঁজরে?

১৫৭

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই
শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক দুখ দিবস দুই-চারি॥

আজ এতদিন বাদে সে ফিরে এসেছে। আজ আমার আনন্দের সীমা নেই। যত দুঃখ আমি পেয়েছি, আজ প্রিয়মুখ দর্শনে তত সুখ আমি পেলাম। আঁচল ভরে কেউ যদি আমাকে মহানিধিও দেয়, তবু আমি তাকে ছেড়ে দেব না। সে যে আমার শীতের ওড়না, আমার গ্রীষ্মের বাতাস, আমার বর্ষার ছত্রছায়া, আমার পারাবারের নৌকা।

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরান গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভালো।
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারানো রতন পাইলাম কোরে ॥
(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥
মলয়-পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে ॥

তুমি এলে, কত কাল পরে এলে, যদি এর মধ্যে মরে যেতাম তাহলে আর দেখা হত না। আমি নারী বলে এই দারুণ বিরহ সইতে পেরেছি—যদি পাথর হতাম তো দীর্ণ হয়ে যেতাম যন্ত্রণায়। কেমন ছিলে বলো। তুমি ভালো থাকলেই আমি ভালো। আমার নিজের ভালো-মন্দ আর কি ? যাক, আজ সব দুঃখ দূরে যাক, এখন কোকিল ডাকুক, ভ্রমর ধরুক গুনগুনানি। মলয় বাতাস বয়ে যাক মৃদু মন্দ। চাঁদ উঠুক আকাশে।

* * * *

প্রেমের এই করুণ অন্তরাগের দিব্যজ্যোতির মাঝখানে আমাদের এই রসতীর্থ-যাত্রার শেষ। কিন্তু আমরা জানি এ ভাবসম্মিলন কোনোদিন বাস্তবে সম্ভব

হয়নি। চিরকাল রাধাকে বইতে হয়েছে শুধু অশেষ প্রতীক্ষার ভার—সেই প্রতীক্ষাই তখন প্রেম।

সে কি ভাববে একা-একা শূন্য রাত
বাজবে বাঁশি কবে পুণ্যদিন আহা দীপ্ত দিন ?
তাই কি দিন তার প্রতীক্ষায়
দীর্ঘ চাউনির মৌন পথ ?

সে কি টানবে দিন-রাত আনবে পথ
তমসাতীরে তার বটের রাত ঘন আঁধার রাত
মেলবে যমুনায় তমাল দিন
পথ কি পাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠায় ?

সে কি স্বপ্নে রূপ দেবে প্রতীক্ষায় ?
তাই তো তন্ময় রাত্রি-দিন, সে তো রাত্রি-দিন
প্রাত্যহিক পালে সে দিন-রাত
ঘরের ডাকে টানে দূরের রথ—
মথুরা ভেঙে যায় এ নিষ্ঠায় ?

(বিষ্ণু দে)

শব্দ-নির্দেশিকা

অ

অখলে—মরলোকে।
অঙ্গদ—বাজু।
অতয়ে—অতএব।
অবেকত—অব্যক্ত।
অভিসর—অভিসারে চলো।
অমিয়া পূর—অমৃতপূর্ণ।
অম্বুদ—মেঘ।
অলকা—চন্দনের চিত্র।

আ

আউলাইয়া—আলুলায়িত করিয়া।
আগ তোলাইলুঁ—অগ্রবন্ধন করা, পূজার পূর্বে দক্ষিণা দিয়া সংকল্প করা।
আগি—আগুন।
আগিলা—অগ্রবর্তী।
আগুলি—অগ্রবর্তিনী।
আগুসরি—অগ্রসর হইয়া।
আত—রৌদ্র।
আঁতর—ব্যবধান।
আধ আঁচরে—অর্ধেক আঁচলে।
আন—অন্য।
আনল ভেজাই—আগুন লাগাই।
আরতি—আকুলতা।
আলা—আলোকিত।
আলাই বালাই—বিপদ-আপদ।
আলো—ও লো।
আশোয়াস—আশ্বাস।

উ

উচ উর—সমুচ্চ বক্ষদেশ।
উচল—উচ্চস্থল।
উজাগর—জাগ্রত।
উজোর—উজ্জ্বল।
উত্তর না নিকসই—জবাব বার হয় না।
উপচঙ্ক—সন্ত্রস্ত।
উপজল—জাগ্রত হইল।
উমতায়লি—উন্মত্ত করিলি।
উরজ—স্তন।

ঊ

ঊয়ল—উদিত হইল।

এ

একঠান—একঠাঁই।

ও

ওর—সীমা।

ক

কছু—কিছু।
কঞ্জ—পদ্ম।
কঞ্চুক—কাঁচুলি।
কণ্টক গাড়ি—কাঁটা পুঁতিয়া।
কতিহুঁ—কোথাও।

কনয়া কুম্ভ—কনক-কলস।

কপালি—অদৃষ্ট সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-গণনা-
কারী, সামুদ্রিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি।

কবহিঁ—কবে।

কবহুঁ—কখনো।

কম্বুকণ্ঠ—শাঁখের মতো মসৃণ অথচ
ত্রি-রেখা অঙ্কিত গলা।

কয়ল—করিল।

কর-কঙ্কণ পণ—হাতের বালা পণ
রাখিয়া অর্থাৎ দাম হিসাবে দিয়া।

কলপ—কল্প পরিমাণ সময়।

কহসি—বলিতেছ।

কঁচুয়া—কাঁচুলি।

কাঁতি—কান্তি।

কানড় ছান্দে—কর্ণাটিকা ছাঁদে কবরী
বিন্যাস।

কান্ত পাহুন—প্রিয়তম প্রবাসী।

কুবোল—কটুবাক্য।

কুলিশ পাতন—বজ্রপাত।

কুহু—অমাবস্যা।

কৈছনে বঞ্চব—কেমন করিয়া কাটাইব।

কোঁড়া—কুঁড়ি।

কোরে—ক্রোড়ে।

খ

খঞ্জরীটা—চঞ্চল খঞ্জন পক্ষী।

খার—অশোধিত লবণ।

খেয়াতি—রটনা, পরিচিতি, খ্যাতি

খোয়সি—খোয়াইতেছ।

গ

গজমোতিম—গজমুক্তা।

গাত—গাত্র।

গান্ধিনী তনয়—অক্রুর।

গিম—গ্রীবা।

গুণগাম—গুণগ্রাম, গুণাবলী।

গুরুয়া—গুরুভার।

গোঙায়ব—কাটাইব।

গোপত—গুপ্ত।

গোরী—গৌরী।

চ

চন্দ—চাঁদ।

চমক মোহে লাই—আমার চমক
লাগে।

চান্দকলা—চন্দ্রকলা।

চার—প্রলোভন।

চিতক-চোর—হৃদয়-চোর।

চিরদিনে—বহুদিন বাদে।

চীর—বসন।

ছ

ছরমে-ঘরমে—শ্রমে ও ঘর্মে।

ছলিয়া—প্রবঞ্চক।

ছাপই—আবৃত করিয়া।

ছিপাই—লুকাইয়া।

জ

জনি—যেন।

জনু—যেন

জরি যাত—জ্বলিয়া যায়।

জাতে আত ভেল—জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই রৌদ্র দেখা দিল

জাদ—খোঁপা।

জারত—জর্জর হইতেছে।

জিউ—জীবন।

জীবইতে—বাঁচিতে।

ঝ

ঝম্পি—দশ দিক ঢাকিয়া।

ঝাঁঝকি ছন্দে—বন্ধ্যার মতো।

ঝাঁপলি—ঢাকিয়া ফেলিল।

ঝামর—মলিন।

ঝারি—কলসি।

ঝুরয়ে—কেঁদে বেড়ায়।

ঠ

ঠাম—ভঙ্গি, লাবণ্য, শোভা, স্থান।

ত

তইঅও—তথাপি।

তনু-রুচি—তনু-সৌন্দর্য।

তাকর—তাহার।

তিতিছে—ভিজিতেছে।

তুলে তৌলাইলুঁ—দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিলাম

তৈখনে—সেই ক্ষণে।

তোড়লমল্ল—মল্লতোড়ল, মেয়েদের গায়ের অলংকার

থ

থলকমল—স্থলপদ্ম।

দ

দগধই—দগ্ধ হয়।

দশন কাঁতি—দাঁতের সৌন্দর্য।

দশবাণ—দশবার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

দড়াঞাছি—নিশ্চিন্ত করিয়াছি।

দঢ়াইলুঁ—দৃঢ় করিলাম।

দ্বিজরাজ—চন্দ্র।

দুগুলি—দুটি গুল অর্থাৎ শিরবিশিষ্ট।

দুতর—দুস্তর।

দুরতর—দুঃসাধ্য।

দুরাপ—দুর্লভ।

দুলহ—দুর্লভ।

দে—দেহ।

দেহলি—দরজার চৌকাঠ।

ধ

ধনি ধনি—ধন্য ধন্য।

ধাতা কাতা বিধাতা—স্রষ্টা, কর্তা ও পালনকর্তা।

ধাধস—দৃঢ়তা।

ধান্ধা—ভ্রম।

ন

নখতর—নক্ষত্র।

নহলি—নবীন।

নিচল—নিম্নস্থান।

নিছনি—উৎসর্গ করিয়া ফেলা।

নিছি দিলুঁ—উৎসর্গ করিলাম।

নিধুবন—রাধা-কৃষ্ণের বিহারস্থলী।

নিন্দ—নিদ্রা।

নিবারণ দিয়া—বোধ মানাইয়া।

নিবারলুঁ—রোধ করিলাম।

হুনিক—ননীর।

নূনা—ক্ষুদ্র।

প

পঙারলু—পার হইলাম।

পটবাস—দেহাবরণ, পট্টবস্ত্র।

পয়ান—গমন।

পরখসি—পরীক্ষা করিতে।

পরতীত—প্রতীতি, প্রত্যয়।

পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

পহুঁ—প্রভু।

পরিখন—পরীক্ষা।

পরিরম্ভণ—আলিঙ্গন।

পরিহার—দৈন্য, মিনতি।

পলাশা—পাপড়ি, দল।

পসারব—প্রসারিত করিব।

পসারিব—প্রকাশিত করিব।

পসাহনি—প্রসাধন।

পসেবে—ঘামে।

পতিয়াই—প্রত্যয়।

পান কনকধূমে—অতি কঠিন তপস্যা, জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপরে অধোমুখে থাকিয়া স্বর্ণবর্ণ ধূম পান।

পাসরিতে—ভুলিতে।

পিন্ধন—বস্ত্র।

পিবএ—পান করিতে।

পিবি—পান করি।

পুহপমালা—পুষ্পমাল্য।

পেখলুঁ—দেখিলাম।

পৈড—ডাব, নারিকেল।

পৌখলি—পৌষ মাস সম্বন্ধীয়।

প্রাতর—প্রভাত।

ফ

ফুকরই—বাজায়।

ফুয়ল—উন্মুক্ত, খুলিয়া পড়িল।

ফুর—বাক্যস্ফুট হওয়া।

ব

বজরক আগি—বজ্রের আগুন।

বঞ্চলি—অতিবাহিত করিলে।

বটেক—এক বট (কড়ি) মূল্য যাহার।

বয়ন—বদন।

বরকান—সুন্দর কানু।

বরনায়রী—বর-নাগরী, নায়িকাশ্রেষ্ঠা।

বরিখন—বর্ষণ।

বলগই—ঝাঁপিযা আসিতেছে।

বলনি—গঠন।

বাখানিতে—ব্যাখ্যা করিতে।

বাট—পথ।

বাত—বাতাস।

বারই—নিবারিত হয়।

বারইতে—বারণ করিতে।

বারল—নিষেধ করিলাম।

বারিজ—পদ্ম।

বারিদ মেহ—জলদানকারী মেঘ।

বাঢ়য়—বৃদ্ধি পায়।

বাহুড়িয়া—ফিরিয়া।

বিঘিনি—বিঘ্ন।

বিছুরল—বিস্মৃত হইল।

বিজুরী রেহা—বিদ্যুতের রেখা।

বিজুরিক পাঁতিয়া—বিদ্যুৎ পংক্তি।
বিলসই—বিহার করে।
বিশিখ—বাণ।
বিহসি—হাসিয়া।
বিহি—বিধি।
বীজই—বাতাস করিতেছে।
বেথা—ব্যথা।
বেয়াধি—ব্যাধি।
বেরি—আবৃত করিয়া।
বেশ বনান—বেশ রচনা।
বৈসায়ব—বসাইব।
ব্রজ মাহা—ব্রজ মাঝে।

ভ

ভরমহি—ভ্রমবশত।
ভাগে পোহায়লুঁ—ভাগ্যের সঙ্গে প্রভাত হইল।
ভাঙু বিভঙ্গি—ভ্রূ-যুগলের ভঙ্গি।
ভানু-সুত—শনি।
ভামিনী—গরবিনী রমণী।
ভালি ভালি—প্রশংসায় 'বেশ বেশ'।
ভাশুর-ভাওই—ভাশুর ভাদ্রবধূ।
ভিতক-চিত—ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত।
ভীতক—ভিত্তিগাত্রে।
ভীত-পুতলি—ভিত্তিগাত্রে ক্ষোদিত পুতুল।
ভেজাই—পাঠাই।
ভোখে—ক্ষুধায়।
ভোরি—মত্তা।
ভৃগু—শুক্র।

ম

মউরপক্ষ শোহনি—ময়ূর পাখনার দ্বারা শোভিত।
মরকত দেবা—মরকতে নির্মিত দেব বিগ্রহ।
মরিযাদ—মর্যাদা।
মা—মাঝ।
মানস সুরধুনী—মানস-গঙ্গা নামক হ্রদ, বৃন্দাবনে অবস্থিত।
মাহা—মাঝ।
মিরীতি—মৃত্যু।
মুগধী—বিহ্বলা।
মুদরি—অঙ্গুরীয়।
মুদরিক—অঙ্গুরীয়।
মুরুছাযত—মূর্চ্চা যায়।
মোহরি—মোহরাঙ্কিত করিয়া রাখা।
মেহ—মেঘ।
মৈলান—ম্লান।
মো মঁরো—আমি মরিলাম।

য

যছু পর—যাহার উপর।
যাগ—যজ্ঞ।
যাগ শত জাগই—শত যজ্ঞের যিনি অনুষ্ঠান করেন।
যাঙ—যাই।
যাবক—আলতা।
যুয়ায়—যোগ্য বা উপযোগী হওয়া।

র

রভস—প্রেমের ক্রীড়া-কৌতুক, সোহাগ।

রশনা—কটিভূষণ।
রসকন্দ—রসের আকর।
রসিয়া—রসিক।
রিঝত—হৃষ্ট হইয়া।
রুরু—এক প্রকার মৃগ।
রোথই—রুষ্ট হয়।

ল

লহু লহু—মৃদু মৃদু।
লেহ—নেহ, স্নেহ, প্রেম।
লোলিত—গলিত।

শ

শতবাণ—উজ্জ্বলতম, শতবার আগুনে পোড়াইয়া যাহার বিশুদ্ধি হইয়াছে।
শপতি—শপথ।
শিখি—কেতু।
শিহালা—শেওলা।
শেজ—শয্যা।

স

সঞে—সঙ্গে।
সচেলে—সবস্ত্রে।
সন্ততি—সতত।
সরবস ধন—সর্বস্ব ধন।
সহয়ে—সহ্য হয়।
সভাবহি—স্বভাব।
সাত—আরাম।
সাজনি—সজ্জা।
সায়র—সাগর।
সিনাঙ—স্নান করি।
সিরজিল—সৃজন করিল।
সুখ-লব—সুখের কণা।
সুগড়—সুগঠিত দেহ।
সুজান—সজ্জন।
সুরঙ্গমালা—সুন্দর লাল রঙের মালা।
সুরত-শিঙ্গার—মিমলন-বিলাস।
সুরতরু—কল্পতরু।
সোঙরি—স্মরণ করিয়া।
সোয়াথ—স্বস্তি।

হ

হরিণ হীন হিমধামা—নিষ্কলঙ্ক চাঁদ।
হারাঙ—হারাই।
হিমকর—চাঁদ।
হেমাগার—স্বর্ণপুরী।

বৈষ্ণব পদ-সংকলন

বাংলাদেশে এ-যাবৎ বৈষ্ণব পদাবলীর বহু সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। মোট কতগুলি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তার সঠিক বিবরণ আজও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। পাঠকদের অবগতির জন্য কয়েকটি সংকলনের নাম নিচে দেওয়া হল :

সংকলন ও সম্পাদকের নাম	কাল
ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি : বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ
গীত-চন্দ্রোদয় : নরহরি চক্রবর্তী	অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ
পদামৃত-সমুদ্র : রাধামোহন ঠাকুর	প্রায় ঐ সময়ে
গীতি-কল্পতরু : গোকুলানন্দ সেন	প্রায় ঐ সময়ে
পদ-কল্পতরু : গোকুলানন্দ সেন	গীতি-কল্পতরুর পরবর্তী সংস্করণ
কীর্তনানন্দ : গৌরসুন্দর দাস	
সংকীর্তনামৃত : দীনবন্ধু দাস	
পদ-রস-সার : নিমানন্দ দাস	
পদ-রত্নাকর : কমলাকান্ত দাস	
পদ-কল্প লতিকা :	
প্রাচীন কবিতা-সংগ্রহ : অক্ষয়চন্দ্র সরকার	১২৮৫ (বঙ্গাব্দ)
শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী : জগদ্বন্ধু ভদ্র	
পদ-রত্নাবলী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার	১২৯২ (বঙ্গাব্দ)
অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী : সতীশচন্দ্র রায়	১৩২৭ (বঙ্গাব্দ)
বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি : দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ	
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪০
বৈষ্ণব পদাবলী : খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুকুমার সেন বিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্যামাপদ চক্রবর্তী	
বৈষ্ণব পদাবলী : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১৯৬১

সূচীপত্র

অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব	বিদ্যাপতি	২১২
অঙ্গনে আওব যব রসিয়া	বিদ্যাপতি	২২৩
অতি সুমধুর মধুর শ্যাম	জ্ঞানদাস	৩০
অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে	বিদ্যাপতি	২২৫
অপরূপ পেখলুঁ রামা	বিদ্যাপতি	৩৪
অব মথুরাপুর মাধব গেল	বিদ্যাপতি	২০৬
অবনত আনন কএ হম রহলিহু	বিদ্যাপতি	৫৯
অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ	গোবিন্দদাস	১১৮
আইস আইস বন্ধু আধ আঁচবে আসি বৈস	—	২৩৮
আজি অদভুত তিমির-রঙ্গ	শশিশেখর	১২৪
আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল	জ্ঞানদাস	২১৯
আজু পরভাতে কাক কলকলি	জ্ঞানদাস	২৩৪
আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ	বিদ্যাপতি	২৩৭
আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি	গোবিন্দদাস	১২৬
আলো মুঞি জানো না	জ্ঞানদাস	৪৪
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা	চণ্ডীদাস	৯৮
এই মনে বনে দানী হইয়াছ	গোবিন্দদাস	৭০
একে কাল হৈল মোর নহলি যৌবন	চণ্ডীদাস	১৯৩
একে কুলবতী ধনি তাহে সে অবলা	চণ্ডীদাস	৪২
এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি	চণ্ডীদাস	৮৭
কত যে কলাবতী যুবতী সুমূরতি	গোবিন্দদাস	৬৯
কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার	বিদ্যাপতি	২২২
কদম্বতরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল	নরোত্তম	১৫৮
কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল	গোবিন্দদাস	১১৪
কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে	রায় শেখর	২১৬
কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল	গোবিন্দদাস	৬২

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই	জ্ঞানদাস	১৯৮
কানুক নিঠুর বচন শুনি সো সখী	পরমানন্দ	৬৬
কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি	চণ্ডীদাস	১৭৫
কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল	বিদ্যাপতি	২২০
কাহারে কহিব মনের মরম	চণ্ডীদাস	৪৯
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর	বিদ্যাপতি	২৩৯
কি পেখলুঁ বরজ রাজ-কুলনন্দন	অনন্তদাস	৩৮
কী মোহিনী জানো বঁধু	চণ্ডীদাস	১৯৬
কুন্দ কুসুমে ভরি কবরিক ভার	গোবিন্দদাস	১৩১
কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ	গোবিন্দদাস	১২৯
কে মোরে মিলাঞা দিবে সো চাঁদ বয়ান	বলরাম	২২৬
কো ইহ পুন পুন করত হুংকার	ঘনশ্যাম	১৩৬
কোথা যাহ পরান রাধার	শঙ্করদাস	২০৪
গগনে অব ঘন মেহ দারুণ	রায় শেখর	১২০
ঘর হৈতে আইলাম বাঁশি শিখিবারে	জ্ঞানদাস	১৬৩
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার	চণ্ডীদাস	৩৯
চলইতে চাহি চরণ নাহি ধাবয়ে	জ্ঞানদাস	১৩৪
চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি	জ্ঞানদাস	১৩৮
চীর চন্দন উরে হার না দেলা	বিদ্যাপতি	২১০
চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূরপুচ্ছ	জ্ঞানদাস	১৫৫
ছাড়িয়া ঘরের আশ করিব সে বনবাস	বলরাম	১৭৬
জপিতে তোমার নাম বংশী ধরি অনুপাম	চণ্ডীদাস	১৭২
জীবন চাহি যৌবন বড়ো রঙ্গ	বিদ্যাপতি	৮৮
ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি	গোবিন্দদাস	৫০
তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম	গোবিন্দদাস	১০৬
তুমি মোর নিধি রাই	বলরাম	১৮৩
তোমাতে আমাতে যেমত পিরীতি	রসময়	১৭৮
তোমার গরবে গরবিনী হাম	জ্ঞানদাস	১৬৮
তোমার লাগিয়া বন্ধু যত দুখ পাই	যদুনন্দন	১৮৮

তোহারি হৃদয় বেণী বদরিকাশ্রম	গোবিন্দদাস	৭২
দরশনে উনমুখী দরশন-সুখে সুখী	শ্যামদাস	৩৫
দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন	বিদ্যাপতি	১৪০
দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা	বলরাম	১৯৯
দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ	গোবিন্দদাস	১০৪
দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা	অনন্তদাস	১০৩
দেইখ্যা আইলাম তারে	জ্ঞানদাস	৮০
দেখিলা যতেক দুখ কহিও বন্ধুরে	বলরাম	২২৪
ধনি কানড় ছান্দে বান্ধে কবরী	গোবিন্দদাস	২৭
ধনি ধনি রমণী-জনম ধনি তোর	বিদ্যাপতি	৬৮
ধনি সহজে রাজার ঝি	কানুরাম	১০০
ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া	শ্রীরঘুনন্দন	৮৪
ধরবা ধরবা ধর	জ্ঞানদাস	১৬৪
ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিলাম ছাই	চণ্ডীদাস	১৮৭
নখপদ হৃদয়ে তোহারি	গোবিন্দদাস	১৪৫
ননদিনী লো মিছাই লোকের কথা	শিবরাম	১৮০
নব অনুরাগে ঘরে রহই না পারি	বলরাম	১৩০
নব অনুরাগিণী রাধা	বিদ্যাপতি	১১৭
নবরে নবরে নব নবঘন শ্যাম	যদুনাথ	১৬৫
নয়ানে নয়ানে থাকে রাতি দিনে	বলরাম	১০৮
না বোল না বোল সখি	জ্ঞানদাস	১৯১
নাচত বৃখভানু কিশোরী	—	১৬১
নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি যা সম	গোবিন্দদাস	২০৩
নাহি উঠল তিরে রাই কমলমুখি	বিদ্যাপতি	৫৮
নিতুই নৌতুন পিরীতি দুজন	চণ্ডীদাস	১৭৭
নিধুবনে শ্যামবিনোদিনী ভোর	রায় শেখর	১০২
পহিলহি রাধা মাধব মেলি	গোবিন্দদাস	৮২
পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে	বিদ্যাপতি	২৩১
পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি	গোবিন্দদাস	৯৪

পিরীতি সুখের দেখিয়া সায়ের	চণ্ডীদাস	১৮৬
পৌখলি রজনী পবন বহ মন্দ	গোবিন্দদাস	১২৮
প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল	বিদ্যাপতি	২০৮
বঁধু কি আর বলিব আমি	চণ্ডীদাস	১৬৬
বঁধু কি আর বলিব তোরে	চণ্ডীদাস	২০০
বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ	চণ্ডীদাস	১৭১
বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইলুঁ	চণ্ডীদাস	১১১
বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ	জ্ঞানদাস	১৯৪
বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে	চণ্ডীদাস	২৪০
বাম ভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে	বংশীদাস	২৩৩
বাহুডিয়া আইস বন্ধু পরান পুতলি	রসময়	২২১
বেলি অবসান-কালে	রামানন্দ	৫২
ভালো হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে	চণ্ডীদাস	১৩৩
ভীতক-চিত ভুজগ হেরি যো ধনি	গোবিন্দদাস	১২৭
ভোখে ভাত না খায় পিয়া তিরিষায় পানি	বলরাম	২১৪
মথুরার নাম শুনি পরান কেমন করে	চম্পতি	২১৫
মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ	জগদানন্দ	১৫৬
মন্দির-বাহির কঠিন কপাট	গোবিন্দদাস	১১৯
মাধব কি কহব দৈব-বিপাক	গোবিন্দদাস	১২২
মাধব কি কহব ধনিক সন্তাপ	গোবিন্দদাস	৯৬
মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল	জ্ঞানদাস	৭৪
মোহন বিজন বনে দূরে গেল সখীগণে	বংশীদাস	৭৬
যব গোধূলি সময় বেলি	বিদ্যাপতি	৪৬
যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত	গোবিন্দদাস	২২৮
যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি	গোবিন্দদাস	৫৭
যে মোর অঙ্গের পবন পরশে	শঙ্করদাস	২০৭
রতন মঞ্জরী ধনি লাবণি সায়র	গোবিন্দদাস	৬৩
রতি-রস ছরমে শ্যাম হিয়ে শূতলি	গোবিন্দদাস	১০১
রসের হাটেতে আইলাম সাজায়্যা পসার	কানুরাম	২১৩

রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা	চণ্ডীদাস	৪১
রামা হে কি আর বোলসি আন	—	১৪৮
রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর	জ্ঞানদাস	৯০
রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি	গোবিন্দদাস	৭৯
লোচন শ্যামর বচনহি শ্যামর	গোবিন্দদাস	১৭৪
শুন বিনোদিনী ধনি আমার কাণ্ডারী তুমি	জগন্নাথ	৭৫
শুন শুন নাগর রসিক সুজান	—	১১২
শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে মোর নিবেদন	—	৮৩
শুন শুন মাধব নিরদয়-দেহ	চম্পতি	১৪৭
শুন শুন হে পরান-পিয়া	জ্ঞানদাস	২৩২
শুনইতে কানহি আনহি শুনত	বলরাম	৬১
শুনইতে কানু মুরলী রব-মাধুরী	গোবিন্দদাস	১৪৪
শুনিয়া দেখিলুঁ দেখিয়া ভুলিলুঁ	জ্ঞানদাস	১৯০
শুনিয়া নিঠুর বচন আমার	যদুনন্দন	৬৭
সই কি না সে বন্ধুর প্রেম	জ্ঞানদাস	৯৩
সই কেনে গেলাম যমুনার জলে	জগদানন্দ	৫৪
সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম	চণ্ডীদাস	৪৮
সই পিয়া সে পিরীতি জানে	রায় শেখর	১০৯
সই পিরীতি আখর তিন	চণ্ডীদাস	১৭৩
সখি কাহে কহ বিপরীত	যদুনন্দন	৬৪
সখি কি পুছসি অনুভব মোয়	কবিবল্লভ	১৬৯
সখি হামারি দুখের নাহি ওর	রায় শেখর	২১৮
সখি হে কাহে কহসি কটু ভাষা	চম্পতি	১৪২
সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও	মুরারী গুপ্ত	১৮৯
সখা হে সে ধনি কে কহ বটে	লোচনদাস	৩২
সখীর বচনে অথির কান	প্রেমদাস	১৫০
সজনি কে কহ আওব মাধাই	বিদ্যাপতি	২০৯
সজনি ভালো করি পেখন না ভেল	বিদ্যাপতি	৪৭
সহচরী মেলি চললি বররঙ্গিনী	গোবিন্দদাস	৫৬

সহজই বিষম অরুণ দিঠি তাকর	ঘনশ্যাম দাস	৩৬
সহজে হুনিক পুতলি গোরী	জ্ঞানদাস	২১১
সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ	জ্ঞানদাস	১৯৫
সুখের লাগিয়া রন্ধন করিলুঁ	চণ্ডীদাস	১৯২
সুন্দরি আমারে কহিছ কি	জ্ঞানদাস	১৭৯
সুন্দরি কাহে কহসি কটু বাণী	জ্ঞানদাস	১৪৬
সুন্দরি কৈছন আরতি তোর	বল্লভদাস	১৩২
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে	গোবিন্দদাস	১৫২
সে যে বৃষভানু সুতা	চণ্ডীদাস	৯৫
হরি গেও মধুপুর হাম কুল-বালা	বিদ্যাপতি	২২৭
হাথক দরপণ মাথক ফুল	বিদ্যাপতি	৯২
হামে দরশাইতে কতহুঁ বেশ করু	রায় শেখর	১০৫
হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার	জ্ঞানদাস	১৩৯
হেদে লো বিনোদিনী	বংশীবদন	৭৭
হেন রূপ কবহুঁ না দেখি	বংশীদাস	৪৩
হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল	গোবিন্দদাস	১১০